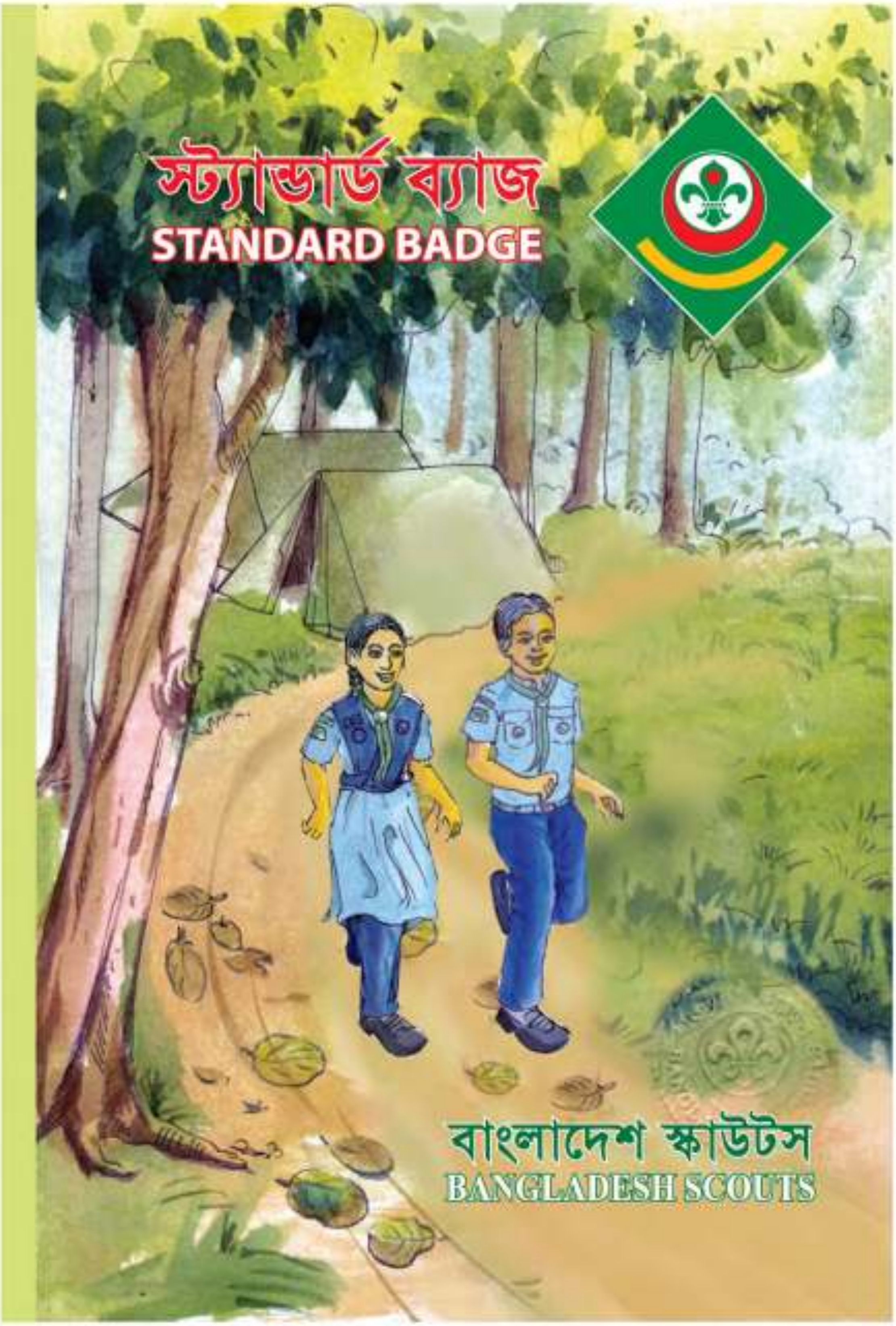
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ
STANDARD BADGE
বাংলাদেশ স্কাউটস
BANGLADESH SCOUTS

# স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ

(স্কাউট প্রোগ্রাম)

# STANDARD BADGE

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

**স্টান্ডার্ড ব্যাজ**
(স্কাউট প্রোগ্রাম)


স্বত্ব : বাংলাদেশ স্কাউটস

গ্রন্থনায় : সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ বই টাস্কফোর্স

সম্পাদনা : প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশনায় : ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : মন্তুরাম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৬

মূল্য : ২৫ (পঁচিশ) টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস : ISBN 984-32-1625-8

---

মুদ্রণে : মাহির প্রিন্টার্স
২২৪/১ ফকিরেরপুল, ১ম গলি, ঢাকা-১০০০

# মুখবন্ধ

স্কাউট প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি একটি চলমান বিষয়। যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বালক-বালিকাদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। স্কাউটিং যেহেতু জীবনের জন্য শিক্ষা তাই পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী স্কাউট প্রোগ্রাম যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও মতামত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের গোড়াপত্তন থেকে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। শুরুর দিকে সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বর্তমান সভাপতি জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ এবং বর্তমান জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)। তবে সকল সময়েই বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম প্রণয়নের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সহ-সভাপতি জনাব মো. হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক প্রয়োজনীয় পরামর্শ,দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্যায়কে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিভিন্ন পর্যায়ের মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ স্কাউটিং কার্যক্রমের প্রথম দশকের শুরুতে প্রকাশিত স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

আনন্দের বিষয় এই যে, প্রথম প্রকাশনার পরবর্তী সময় থেকে স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ এবং যুগোপযোগী করার দীর্ঘ পরিক্রমণে আরো অনেকে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে প্রোগ্রামকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য নিজেদের সম্পৃক্ত করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন-স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যার শুরু আছে তবে শেষ নেই।

সমসাময়িক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রণীত প্রোগ্রামকে যুযোগযোগী, সুপরিকল্পনা প্রসূত নীতিমালা বলে অভিহিত করা যায়। এই বইয়ে স্কাউট প্রোগ্রামের স্ট্যান্ডার্স ব্যাজকে একটি ছকে আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সকলে অতি সহজে এবং এক নজরে স্কাউট প্রোগ্রামের এই স্তর সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অর্জিত জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে স্কাউটরা আরো অধিক বাস্তব ভিত্তিক স্কাউটিং দক্ষতা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান সময়ের বালক-বালিকাদের কাছে স্ট্যান্ডার্জ ব্যাজ বইটি গ্রহণযোগ্য ও আনন্দদায়ক হলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল ও স্বার্থক বলে মনে করবো। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ ও বই প্রকাশনায় যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময়, শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস ও আমার পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে জানাই স্বশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

**মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান**
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

# পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বইসমূহের সহায়তায় বয়সভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বই সমূহে স্কাউটিং কার্যক্রমে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিকনির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা আকর্ষণীয় বইগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডল্ট লিডারদের জন্য যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ-

| | |
|---|---|
| এইডস টু স্কাউটিং | -১৮৯৯ এ বই পড়েই অনেকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে |
| স্কাউটিং ফর বয়েজ | -১৯০৮ স্কাউট শাখার জন্য |
| উলফ কাব হ্যান্ডবুক | -১৯১৬ কাব শাখার জন্য |
| এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ | -১৯২০ অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য |
| রোভারিং টু সাকসেস | -১৯২২ রোভার স্কাউট শাখার জন্য |

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্যক্রমে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হতো। এই স্তরভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে-টেন্ডার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সুচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় টেন্ডার ফুট বইটিকে কচি কদম, সেকেন্ড ক্লাস বইটিকে দ্বিতীয় কদম এবং ফাস্ট ক্লাস বইটিকে দৃপ্ত কদম নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি বালকদের স্কাউট শিক্ষা নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহুরুল আলম ১৯৫৯ সালে কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক বইটিকে কাব স্কাউট শিক্ষা নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর মুহুর্ত থেকে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পুনর্গঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুনভাবে শুরু করা রোভারিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটার আ স মু মাকসুদুর রহমান রোভার পরিকল্পনা নামে বইটির পান্ডুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি.ও.আর (নীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে "গঠন ও নিয়ম" নামে নতুন ভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপন করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারন করে ঐ প্রোগ্রামের আলোকে বয় স্কাউট শাখার বই লেখা হয়। প্রোগ্রাম অনুসারে বইগুলির পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তৎকালীন রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ে রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভার স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পান্ডুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

| | |
|---|---|
| সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড | ১৯৭৯ |
| প্রোগ্রেস | ১৯৮০ |
| সার্ভিস | ১৯৮১ |

এই স্তর ভিত্তিক বইসমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটেরা স্ব স্ব স্তরের প্রোগ্রাম অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিত করে বয় স্কাউট নামে এটি অখন্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখন্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরও বেশী কার্যকরী করার জন্য স্তরভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

| | | |
|---|---|---|
| সদস্য ব্যাজ | আরিফ বিল্লাহ আল মামুন | ১৯৯৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ | মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান | ১৯৯৫ |
| প্রোগ্রেস | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ১৯৯৬ |
| সার্ভিস ব্যাজ | মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া | ১৯৯৬ |

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিক থেকে কাব ও রোভার স্কাউটসের প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহের পান্ডুলিপি প্রনেতা ও প্রকাশ সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

| | | |
|---|---|---|
| সদস্য ব্যাজ | মোঃ আব্দুল ওয়াহাব | ১৯৯৫ |
| তারা ব্যাজ | মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন | ১৯৯৬ |
| চাঁদ ব্যাজ | রওশন আরা বিউটি | ১৯৯৭ |
| চাঁদতারা ব্যাজ | মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার | ১৯৯৭ |
| রোভার সহচর | মোফাখখার হোসেন | ১৯৯৭ |
| সদস্য স্তর | মোফাখখার হোসেন | ১৯৯২ |
| প্রশিক্ষণ স্তর | মোঃ আরিফুজ্জামান | ১৯৯৫ |
| সেবাস্তর | আদিল হায়দার সেলিম | ১৯৯৬ |

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত রোভারিং টু সাকসেস বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহাবুবুল আলম বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে আরও বেশী আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক নাজু প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্সে দু'টিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়ায় রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মোঃ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দু'টি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন,পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তা দান করেন এবং বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রামের কাঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ আয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় উপ কমিশনার সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মোঃ মাহমুদুল হক এবং মোঃ মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা সমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট ও রোভার শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ আরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহবায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাদিদ সাঈদ। টাস্কফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির তৎকালীন সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহীত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এই বইগুলোর পান্ডুলিপি তৈরির জন্য আলাদা আলাদা টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। স্কাউট সদস্য ব্যাজ ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ বই প্রকাশনার জন্য বই পান্ডুলিপি প্রণয়ণ করেন স্কাউটার শহীদুল ইসলাম (রিপন), রোভার স্কাউট মোঃ আওলাদ হোসেন (মারুফ), রোভার স্কাউট মোঃ ইরেশ রহমান ও রোভার স্কাউট এইচ এম সাইফুল ইসলাম। নবায়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদনসহ প্রণয়নকৃত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত এই বই প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিকে আরও বেশী জোরদার করেছেন।

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১. | মুখবন্ধ | ০৩ |
| ২. | পটভূমি | ০৪ |
| ৩. | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ | ১০ |
| ৪. | স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস | ১০ |
| ৫. | জাতীয় পতাকা | ১২ |
| ৬. | সাংগঠনিক জ্ঞান | ১৭ |
| ৭. | ইসলাম ধর্ম | ১৯ |
| ৮. | হিন্দু ধর্ম | ২০ |
| ৯. | খ্রিষ্ট ধর্ম | ২২ |
| ১০. | বৌদ্ধ ধর্ম | ২৬ |
| ১১. | স্কাউট ওন | ২৮ |
| ১২. | দড়ির কাজ | ৩১ |
| ১৩. | বাঁশির ডাক ও হস্ত সংকেত | ৩৫ |
| ১৪. | অভিযান | ৩৭ |
| ১৫. | অনুসরক চিহ্ন | ৩৮ |
| ১৬. | অনুমান | ৪৩ |
| ১৭. | শরীর চর্চা ও বিপি পিটি | ৪৬ |
| ১৮. | ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা | ৫০ |
| ১৯. | পর্যবেক্ষণ | ৫১ |
| ২০. | স্কাউট সেবা | ৫২ |
| ২১. | প্রাথমিক প্রতিবিধান | ৫৩ |
| ২২. | তথ্যানুসন্ধান | ৫৯ |
| ২৩. | সঞ্চয়/উপার্জন করা | ৬০ |
| ২৪. | মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস | ৬১ |
| ২৫. | পরিবেশ | ৭৪ |
| ২৬. | কম্পাস | ৭৬ |
| ২৭. | ফিল্ড বুক | ৭৮ |
| ২৮. | মানচিত্র | ৭৯ |
| ২৯. | কম্পিউটার | ৮০ |

## স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জন করার আগে তোমাকে সদস্য ব্যাজের পরীক্ষায় পুনরায় পাশ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে ইউনিট লিডারের আস্থাভাজন হতে হবে। ৬ থেকে ৯ মাস সময়ের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজের প্রোগ্রামগুলি সম্পন্ন করা যাবে।

## স্কাউট আদর্শ

### স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস

বিশ্বব্যাপী স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (Robert Stephenson Smyth Lord Baden Powell of Gilwell) তাঁকে সারা দুনিয়ার স্কাউটরা সংক্ষেপে বি. পি. বলে জানে। তাঁর জন্ম হয় ১৯৫৭ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কে। তিনি কর্মজীবনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বি.পি. ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র সীমান্ত শহর ম্যাফেকিং-এ যখন ২১৭ দিন বুয়রদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁর নিজ সেনাদলের পাশাপাশি স্থানীয় বালকদের ব্যবহার করে যে সফলতা লাভ করেছিলেন, পরবর্তীতে সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্কাউটিং বালকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নেন এবং কালক্রমে তা মহান আন্দোলনে রূপ নেয়।

ম্যাফেকিং জয়ের পর দেশে ফিরে ২০ জন বালক নিয়ে ২৯ আগস্ট থেকে ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ব্রাউন-সী দ্বীপে ব্যাডেন পাওয়েল যে পরীক্ষামূলক ক্যাম্প আয়োজন করেছিলেন; তারই ফলশ্রুতিতে সারা ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এবং পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ সালে স্কাউটদের জন্য সবচেয়ে ব্যবহার উপযোগী বি,পি,র লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালের মধ্যে চিলি, জার্মান, সুইডেন, ফ্রান্স, নরওয়ে, হাংগেরি, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, সিংগাপুর, প্রভৃতি দেশে স্কাউট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক জনপ্রিয় এই বইটি ছিল স্কাউটদের জন্য দিক নির্দেশনা যা এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। ১৯১৪ সালে কাব স্কাউটিং এবং ১৯১৮ সালে স্কাউটের বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা রোভারিং শুরু হয়। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডের অলিম্পিয়াতে বিশ্বের প্রথম জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষে ১৯১০ সালে স্কাউটিং শুরু হলেও তখন শুধু ইংরেজ ছেলেদের জন্য স্কাউটিং সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে ভারতবাসীদের স্কাউটিং করার সুযোগ করে দেয়। ভারতীয়দের নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা দল গঠিত হতে থাকে। ১৯৩৮ সালে ভারত বয় স্কাউট সমিতি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার স্বীকৃতি পায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে ১৯৪৭ সালের পয়লা ডিসেম্বর করাচিতে পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। সে সময়ে বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল। নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তখন এখানে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট সমিতি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি। প্রথম জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হন পিয়ার আলী নাজির। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বাংলাদেশ স্কাউটসকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১৯৭৪ সালের পয়লা জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতিকে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সের ১০৫ নম্বর সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত যশোরের পুলেরহাটে, ১৯৭৭ সালের ২ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রংপুরে এবং ঐ বছর এপ্রিল মাসের ২ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাতীয় স্কাউট র‍্যালী। ১৯৭৭ সালের ২৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকার ঝিলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয় কাব স্কাউটদের প্রথম বাংলাদেশ কাব ক্যাম্পুরি।

১৯৭৮ সালের ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি এবং ২১ থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকে যথাক্রমে রোভার স্কাউটদের প্রথম বাংলাদেশ রোভার মুট এবং বয় স্কাউটদের প্রথম জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৮ সালের ১৮ জুন পঞ্চম কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউট সমিতির নাম দেওয়া হয় বাংলাদেশ স্কাউটস। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস ১২টি অঞ্চলে বিভক্ত। সেগুলো হল ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, দিনাজপুর, রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল।

২০০৭ সালে বিশ্বব্যাপী স্কাউট আন্দোলনের শতবর্ষ উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে ২৮ জুলাই ০২ থেকে আগস্ট ০৭ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের নিয়ে শতবর্ষ সৃজনী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

# জাতীয় পতাকা

**জাতীয় পতাকা উড়ানোর নিয়ম**

জাতীয় পতাকা দেশের পরিচয় বহন করে। তাই এই পতাকা অত্যন্ত গৌরবের ও সম্মানের। নিজ দেশের গৌরব ও সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। স্কাউটের বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা সঠিকভাবে উড়ানো স্কাউটদের দায়িত্ব।

জাতীয় পতাকা সঠিকভাবে ও যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে উড়াতে হয়। পতাকার ছোট দিকটা দণ্ডে সঙ্গে বাঁধা থাকে। লম্বা দিকটা উড়তে থাকে। রাতের বেলা জাতীয় পতাকা উড়ানো হয় না। সাধারণত সূর্য ওঠার পরে পতাকা উড়াতে হয় এবং সূর্য অস্ত যাবার আগেই নামিয়ে ফেলতে হয়। উড়ানো ও নামানোর সময় ইউনিফর্ম পরা স্কাউটেরা স্কাউট সালাম দেবে। অন্যরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

জাতীয় পতাকার সঙ্গে অন্য কোন পতাকা উড়াতে হলে সেগুলো ভিন্ন দণ্ডে জাতীয় পতাকার নিচে উড়াতে হবে। সাধারণত অন্যান্য পতাকা জাতীয় পতাকার দু'পাশে সমান দূরে দূরে থাকবে। দু'দিকের সংখ্যা সমান হতে হবে। তবে বেজোড় হলে বাঁ দিকে একটি বেশি থাকবে। উড়াবার সময় অন্যান্য পতাকা জাতীয় পতাকার আগে ওঠানো যাবে না। আর নামাবার সময় জাতীয় পতাকা সকল পতাকার পরে নামবে। ময়লা, ছেঁড়া ও রং ওঠা পতাকা ব্যবহার করা যাবে না। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও পতাকা উড়ানো যায়। প্রত্যেক স্কাউটকে এ কাজটি সঠিকমত শিখতে হবে। জাতীয় পতাকা উড়ানোর পর যে রশির সাহায্যে পতাকা উড়ানো হল সে রশির প্রান্তকে পতাকা দন্ডের সাথে বড়শি গেরো (Clove Hitch) দিয়ে বাঁধতে হবে। জাতীয় পতাকা দড়ির সঙ্গে শীট বেন্ড (Sheet Bend) দিয়ে বাঁধতে হবে।

**জাতীয় পতাকা উড়ানোর পদ্ধতি ঃ** পতাকা উড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ পৃথক লাঠি বা একই মাপ ও উচ্চতার পতাকা দণ্ড ব্যবহার করে থাকে। জাতীয় পতাকার মাপও প্রায় একই ধরনের। অধিকাংশ দেশ মনে করে যে, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এর অবস্থান অন্যান্য পতাকার মাঝখানে থাকবে। সাধারণত এর অবস্থান কোন ভবনের প্রধান প্রবেশ পথে প্রবেশকারী পর্যবেক্ষণকারীর বাম দিকে অন্য পতাকার ডান দিকে থাকে এবং একই সারিতে অনেকগুলো পতাকার মাঝখানে জাতীয় পতাকা উড়ানো হয় বা সারির যে কোন এক প্রান্তে অন্যান্য পতাকার উপরে থাকে।

**(ক) ভবনে ঃ** লম্বা লাঠি/ পতাকাদণ্ড বা দড়ির শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড়াতে হবে যাতে পতাকার অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ না করে। পাশাপাশি দুটি পতাকা উড়াতে হলে জাতীয় পতাকা ডান পার্শ্বে থাকবে।

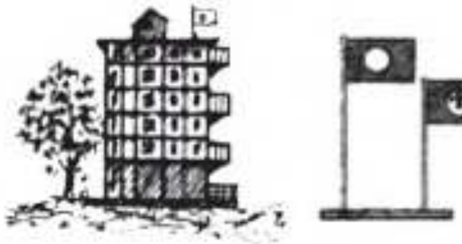

**(খ) সড়কে ঃ** জাতীয় পতাকা লম্বা দণ্ডে বা উচ্চ লাইট পোস্টে উপরে সোজা অবস্থায় ঝোলানো থাকবে যাতে চলমান যানবাহনের ওপরে থাকে। একই পোস্টে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত দণ্ডে পতাকা উড়ানোর সময় জাতীয় পতাকা ডান পার্শ্বে থাকবে এবং জাতীয় পতাকা দণ্ড অন্য পতাকাসমূহের দণ্ডের ওপরে থাকবে।

**(গ) ভূমিতে ঃ** জাতীয় পতাকা সকল পতাকার আগে উত্তোলন করতে হবে এবং অন্যান্য পতাকার উপরে থাকবে।

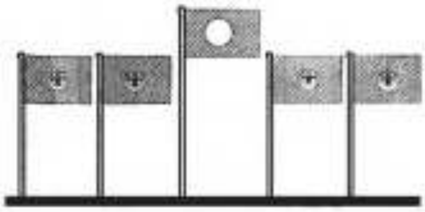

ভবনে ব্যবহৃত পতাকার মাপ ঃ

(ক) ভবনের সাইজ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মাপের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(১) ৩ মিটার X ১.৮০ মিটার বা ১০′ X ৬′

(২) ১.৫ মিটার X ৯০ সেঃ মিঃ বা ৫′ X ৩′

(৩) ১.২৫ মিটার X ৪৫ সেঃ মিঃ বা ২.৫′ X ১.৫′

(খ) মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত পতাকার মাপ ঃ

(১) বড় ধরনের গাড়ীতে ৩৭.৫ সেঃ মিঃ X ২২.৮ সেঃ মিঃ বা ১৫″ X ৯″

(২) মাঝারী বা ছোট গাড়ীতে ২৫.৩ সেঃ মিঃ X ১৫ সেঃ মিঃ বা ১০″ X ৬″

(গ) আন্তর্জাতিক বা দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন টেবিলে ব্যবহৃত পতাকার মাপঃ

২৫.৩ সেঃ মিঃ X ১৫ সেঃ মিঃ বা ১০″ X ৬″

## খ) জাতীয় পতাকা বিবর্তনের ব্যাখ্যা

সদস্য ব্যাজ বইয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি, অংকেন, পদ্ধতি, পতাকার রঙ ও তাৎপর্য সম্পর্কে  অবগত হয়েছো এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ বইয়ে পতাকার মাপ, জাতীয় পতাকার উড়ানোর নিয়ম ইত্যাদি ছাড়াও জাতীয় পতাকার বিবর্তণ সম্পর্কে আরো কিছু জানবে। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারায় আদিম মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে এক সময় দল বেঁধে চলতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে বন্য পশু থেকে আত্মরক্ষা ও শিকার করার উদ্দেশ্যে মানুষ দল বাঁধে। পর্যায়ক্রমে যখন আস্তে আস্তে সম্পদের স্বল্পতা দেখা দেয় তখন এক দলের সঙ্গে আর এক দলের লড়াই শুরু হয়। সে সময় দল বা টোটেমগুলো বিভিন্ন পশুর নামে নামকরণ করা হত। টোটেমের সদস্যগণ উক্ত পশুর প্রতিকৃতি তাদের হাতিয়ারে অঙ্কিত করে নিত। কালক্রমে যুদ্ধের সময় উক্ত প্রতিকৃতি গাছের বাকল বা পশুর চামড়ায় এঁকে দলের পরিচয় বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হত। এটা হচ্ছে জাতীয় পতাকার আদিরূপ।

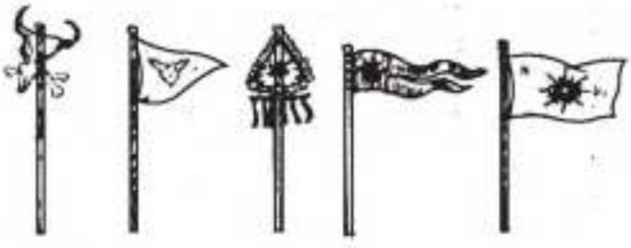

জাতীয় পতাকার ধারণা তৈরি হয় অষ্টদশ শতাব্দির শুরুর দিকে। প্রথমত যুদ্ধ বিগ্রহের সময় দেশের প্রতিক হিসেবে পতাকার ব্যবহার শুরু হলেও পরবর্তীতে জাতীয়তা বোধের প্রতিক হিসেবে জাতীয় পতাকার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা আমেরিকার বিপ্লবের পর ১৭৭৭ সালের নৌ সমরের প্রতিক থেকে তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশ ইউনিয়ন ফ্ল্যাগও তৈরি হয়েছে সপ্তদশ শতকের নৌ সমরের প্রতিক থেকে, যদিও তা জাতীয় পতাকা হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯০৮ সালে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৯২২ অব্দে চীনের চৌ বংশের রাজত্ব কালে একটি সাদা পতাকা ব্যবহার করা হত। প্রাচীন ভারতে পতাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রথ বা হাতি কর্তৃক পতাকা বহন করা হত। ভারতীয় পতাকা ছিল সাধারণত ত্রিকোণাকৃতি, টকটকে লাল বা ঘন সবুজ রঙ, কোন প্রতিকৃতি সম্বলিত এবং ঝালর বিশিষ্ট।
ভারত ও চীনে পতাকা সঙ্কেত প্রদানের কাজেও ব্যবহৃত হত। যুদ্ধের ময়দানে সাদা পতাকা প্রদর্শন করে যুদ্ধ বিরতির সঙ্কেত দেওয়া হয়।

ইসলাম প্রবর্তনের পর মুসলিম জগতে পতাকায় জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। উমাইয়া আমলে সাদা, আব্বাসীয় আমলে কালো পতাকা এবং ফাতেমীয় আমলে সবুজ রংয়ের পতাকা ব্যবহার করা হত। পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের পতাকায় সবুজ রং অধিক ব্যবহার হতে থাকে এবং চাঁদ তারা ইসলামী প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশের রাষ্ট্রসমূহের পতাকায় সাধারণত সবুজ, হলুদ ও লাল রং লম্বালম্বি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের অনেক দেশে সবুজ, নীল, কালো ও সাদা এর মধ্যে তিনটি রঙ সমান্তরালভাবে তাদের পতাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর সকল দেশের জাতীয় পতাকা রয়েছে। পতাকা দেশেরই পরিচয় বহন করে।

**নিয়ম পদ্ধতি ঃ**

জাতীয় পতাকা মর্যাদা যত্ন সহকারে সংরক্ষন করতে হবে। কোন প্রকার ভুলের কারনে পতাকা পৃষ্ঠা ছিড়ে গেলে তা পরিষ্কার করে ভাঁজ করে রাখতে হবে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, কোন ভাবেই পুড়ে ফেলা, ফেলে রাখা যাবে না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ছিল সবুজ জমিনের মাঝখানে গোলাকার লাল সূর্য। লাল সূর্যের মাঝখানে ছিল সোনালি রংয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই পতাকা ব্যবহার করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতি মনে করল যে পতাকার মাঝখানে দেশের মানচিত্র দেওয়া ঠিক নয়। তাই মাঝখান থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া হয়েছে। তৈরি হয়েছে বর্তমান পতাকা।

# সাংগঠনিক জ্ঞান

**(ক) নিজ গ্রুপ স্কাউটসের গঠন ও কার্যাবলী জানা ঃ**

দুই ধরনের স্কাউট গ্রুপ রয়েছে ১) প্রাতিষ্ঠানিক স্কাউট গ্রুপ ও ২) মুক্ত স্কাউট গ্রুপ। এই দুই ধরনের স্কাউট গ্রুপের গঠনের ক্ষেত্রে সামান্য ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের একটি গ্রুপ কমিটি থাকবে যার সভাপতি হবেন প্রাতিষ্ঠানিক স্কাউট গ্রুপের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধান; মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ক্ষেত্রে সভাপতি হবেন ঐ স্কাউট গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত যে কোন ব্যক্তি। গ্রুপ কমিটির একজন সম্পাদক থাকবেন, থাকবেন কোষাধ্যক্ষ, সদস্য ও সহ সভাপতি। গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল থাকবে, থাকবে ইউনিট লিডার, গ্রুপ স্কাউট লিডার, সহকারী স্কাউট লিডার, প্রতিটি ইউনিটের জন্য একজন করে ইউনিট লিডার; সহকারী ইউনিট লিডার একাধিক থাকতে পারবেন। উল্লেখিত কমিটিগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সভায় মিলিত হবেন, বার্ষিক কাউন্সিল করবেন এবং সঠিকভাবে স্কাউট গ্রুপ পরিচালনা করবেন। একটি গ্রুপের কে কোন দায়িত্বে আছেন, তাঁর কাজ কি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে অর্থাৎ নিজ গ্রুপ স্কাউটসের গঠন ও কার্যাবলী জানতে তোমাকে ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার ও গ্রুপ স্কাউট লিডারের সাহায্য নিতে হবে। মনে রাখতে হবে একটি স্কাউট গ্রুপ মূলতঃ একাধিক ইউনিট নিয়ে গঠিত হয়; যেমন সেখানে থাকতে পারে এক বা একাধিক কাব স্কাউট ইউনিট; এক বা একাধিক স্কাউট ইউনিট, এক বা একাধিক রোভার স্কাউট ইউনিট। তেমনিভাবে শুধুমাত্র একাধিক কাব স্কাউট ইউনিট বা একাধিক স্কাউট ইউনিট অথবা একাধিক রোভার স্কাউট ইউনিট নিয়েও একটি গ্রুপ গঠিত হতে পারবে; এখানে ছেলেদের ইউনিট ও মেয়েদের ইউনিট থাকতে পারে। আবার একটি ইউনিট নিয়ে গঠিত হলেও স্কাউট গ্রুপ বলা যাবে।

**(খ) নিজ গ্রুপের ইতিহাস জেনে গ্রুপের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা ঃ**

নিজ গ্রুপ স্কাউটসের গঠন ও কার্যাবলী জানার পাশাপাশি তোমাকে নিজ স্কাউট গ্রুপের ইতিহাস জানতে হবে। কবে কিভাবে তোমাদের স্কাউট গ্রুপ গঠিত হয়েছে। গ্রুপের প্রতিষ্ঠা লগ্নে কে কোন দায়িত্বে ছিলেন; যেমন-সভাপতি, সম্পাদক, ইউনিট লিডার, গ্রুপ স্কাউট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, সিনিয়র উপদল নেতা, উপদল নেতা, সহকারী উপদল নেতা কারা ছিলেন। কয়টি ইউনিট ছিল, উপদল কয়টি ছিল, উপদলের নাম কি ছিল; স্কাউট সমাবেশ, জাম্বুরী ও অন্য কার্যক্রমে যোগদান; অ্যাওয়ার্ড অর্জনসহ আরো কোন সাফল্য যদি থাকে প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। এছাড়াও গ্রুপের বর্তমান কাঠামো সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রেও তোমাকে তোমার ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার ও গ্রুপ স্কাউট লিডারের সাহায্য করতে পারেন।

**নিচে মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হল :**

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর-এ বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ, মৌচাকে অবস্থিত দেশের একমাত্র স্কাউট স্কুল 'মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয়'; বাংলাদেশ স্কাউটস পরিচালিত বিদ্যালয় এটি। এই বিদ্যালয়ের সকলেই হবে স্কাউট সেই লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে ৪টি কাব স্কাউট ইউনিট, ছেলেদের ৭টি স্কাউট ইউনিট এবং মেয়েদের ৬টি ইউনিট রয়েছে।

ইউনিট লিডার হিসেবে আছেন ১জন কাব স্কাউট লিডার ৭জন পুরুষ ও ৬জন মহিলা ইউনিট লিডার এর মধ্যে উডব্যাজার ১জন, সহকারী লিডার ট্রেনার ২জন এর একজন ইতোমধ্যে কোর্স ফর দি লিডার ট্রেনার্স সম্পন্ন করেছেন। ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন করেছেন আরো ৪জন। এই গ্রুপের একটি গতিশীল স্কাউট গ্রুপ কমিটি রয়েছে।

মৌচাক উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ থেকে এ পর্যন্ত ৭জন ছেলে ও ২জন মেয়েসহ মোট ৯জন স্কাউট প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইউনিট লিডারগণের মধ্যে অনেকে জাতীয় পর্যায় থেকে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। স্কাউটরা নিয়মিতভাবে জাম্বুরী, কমডেকা, আঞ্চলিক ও জেলা স্কাউট সমাবেশে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও প্রতিটি স্কাউট ও জাতীয় কর্মসূচিতে মৌচাক উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের স্কাউটরা সক্রিয়ভাবে যোগদান করে আসছে। স্কাউটদের পাশাপাশি স্কাউট লিডাররাও উল্লেখিত কার্যক্রমে যোগদান করেন, কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

# ধর্ম পালন

**ক) নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা।**

নিজ নিজ ধর্মে প্রতিদিন যা যা করতে বলা হয়েছে সে সমস্ত বিষয়সমূহ সময়মত সম্পাদন করতে হবে। যেমন ঃ- নামাজ পড়া, পূজা করা, অন্যকে সেবা করা ইত্যাদি।

## ইসলাম ধর্ম

চিত্র: মসজিদ

**নামাজ ঃ** পূর্বেই (সদস্য ব্যাজ বইয়ে) আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পর্কে জেনেছি এ পর্যায়ে সূরা ফাতেহা সহ আরো চারটি সূরা অর্থ সহ শিখব এবং নিয়মিত নামাজ আদায় করব।

**রোজা ঃ** সদস্য ব্যাজে আমরা রোজার প্রাথমিক কথা জেনেছি। এ পর্যায়ে আমরা রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলব, রোজার ফরজ সমূহ এবং কি কি কারনে রোজা ভঙ্গ হয় সে সম্পর্কে জানব। ধর্মীয় এ বিষয় সমূহ আমরা নিকটবর্তী মসজিদের ইমাম সাহেব অথবা তোমার নিকটবর্তী ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন যে কোন লোকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব এবং দৈনন্দিন জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাব।

**শবে মিরাজ ঃ** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনার রাত হিসেবে এ রাতটি স্মরণীয়। এ রাতে তিনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে উর্ধ্ব আকাশে গমন করেন। এ রাতে ইবাদত-বন্দেগী করা খুব ভালো।

**শব-ই-বরাত ঃ** ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতকে শবই-বরাত বলে অবিহিত করা হয়। এ রাতে আল্লাহ মানুষের মোনাজাত কবুল করেন। এটি অত্যন্ত মহিমাময় এবং পবিত্রতম রাত্রি।

**ফাতেহা দোয়াজ দহম ঃ** ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এদিনই জন্ম নিয়েছিলেন আবার এদিনই ইন্তেকাল করেছিলেন। এদিনকে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী বলে।

**ফাতেহা ইয়াজ দহম ঃ** ১১ রবিউস সানী। এদিন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী [রঃ] এর ওফাত দিবস। এদিনটিও অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

**আশুরা ঃ** ১০ই মহররমকে মুসলমানেরা আশুরা হিসেবে পালন করে। এদিন নীতির প্রশ্নে আপোষহীন হবার প্রতিজ্ঞা করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন [রাঃ] কারবালার প্রান্তরে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মুসলমানেরা এদিনকে বরণ করেছে শোক দিবস হিসেবে।

# হিন্দু ধর্ম

*চিত্র: মন্দির*

**ধর্ম তত্ত্ব ঃ** ধর্ম মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। হিন্দু ধর্ম কেউ প্রচার করেনি। এটি ঈশ্বরের বাণী। প্রাচীন ঋষিদের নিকট এ বাণী প্রতিভাত হয়েছিল। ঋষিগণ গুরু শিষ্য পরম্পরায় এ বাণী মেনে চলতেন। কালক্রমে তা লিপিবদ্ধ হয়। যে ঋকবেদে ঈশ্বর বলেছেন, 'একোহহম' অর্থাৎ আমি এক, সুতরাং অদ্বিতীয়। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা সংহারকর্তা। ঈশ্বরের বাণী ধর্ম মানার প্রথম শর্ত।

ঈশ্বর আছেন-সর্বদা কায়মনোবাক্যে এ বিশ্বাস করতে হবে। ধর্ম হল সাক্ষাৎ অনুভব। কতকগুলো বিশ্বাস, কতকগুলো আচার ও কতকগুলো অনুষ্ঠান-এ অনুভবে সহায়ক হয়।

**বিশ্বাস ঃ** ঈশ্বর ধর্মের মূল। অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি অদ্বিতীয় ইত্যাদি বিশ্বাসই ধর্মের মূলে নিয়ে যায়।

**আচার ঃ** সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি। বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান-এ একদিকে বাদ দিলে ধর্ম রক্ষা পায় না।

**ঈশ্বরবাদ ঃ** বেদে বাগযজ্ঞের মন্ত্রাদি আছে। বেদে এই মন্ত্রটিও আছে একোহত। আমি এক। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জ্যোতির্ময় ও মহান। তিনি ব্রহ্ম; তিনি সর্বব্যাপী।

**আত্মা ঃ** ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন। প্রাণীগণের মধ্যে তিনি আত্মারূপে। আত্মা নষ্ট করা যায় না। আত্মা নিরাকার; প্রাণীগণের শরীর আছে, কিন্তু তিনি শরীর নন। মানুষ মারা যায়, কিন্তু আত্মা মরে না। আত্মা অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মাকে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়।

**ঈশ্বরের নাম ঃ**

প্রথম ঃ ব্রহ্ম
দ্বিতীয় ঃ আত্মা
তৃতীয় ঃ ভগবান

**ঈশ্বরে মাহাত্ম্যসূচক স্তবস্তোত্র ও প্রার্থনা ঃ**

১। ন তস্য কার্যং ও কারণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চভ্যধিকঞ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রুয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

**সরলার্থ ঃ** ঈশ্বরের সমান বা বড় কেউ নেই। তার অনন্ত শক্তি। স্বাভাবিক শক্তির বলেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন।

২। ন তত্র সূর্য্যে ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি।

**সরলার্থ ঃ** সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র-তারকাও না। এইসব বিদ্যুৎও নয়, অগ্নির কথা আর কি? তিনি দপ্যিমান বলেই অপর সবার দীপ্তি [প্রকাশ] পাচ্ছে। তাঁর দীপ্তিতেই সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে।

৩। তুমি নির্মল কর মঙ্গল-কর
মলিন মর্ম মুচায়ে,
তব্যপুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর,
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ-শূণ্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীরে আঁধারে।
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল পাথরে।
প্রভু বিশ্ব বিপদহন্তা
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা;
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।

৪। অন্তর মম বিকশিত করম অন্তরতর হে
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভর কর হে-
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধু
সঞ্চার কর সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত্ত নিস্পন্দিত কর হে।
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে।

# খ্রিষ্ট ধর্ম

চিত্র: গির্জা

**খ্রিষ্ট ধর্ম ঃ** পাপে পতিত মানবজাতির মুক্তির জন্য ঈশ্বর তার পুত্র যিশুখ্রিষ্টকে এ জগতে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা পরিত্রাণ লাভের জন্য খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই বিশ্বাসে স্থির ও অবিচল থেকে তার অনুসারী হয়েছে তারা হলো খ্রিষ্টান। আর যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা প্রচারিত ধর্মের নাম খ্রিষ্টধর্ম।

**খ্রিস্টের অনুসারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ঃ** খ্রিস্ট মানবীয় ও ঐশ্বরিক স্বভাব নিয়ে জন্ম নিয়েছেন। তার আহবানে সাড়া দিয়ে যারা তার অনুসারী হয় এবং তার নির্দেশিত পথে চলে ও বাস্তব জীবনে তার শিক্ষা পালন করে চলে তারাই প্রকৃত খ্রিস্টান হিসাবে চিহ্নিত হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র বাইলে বলা আছে ঃ

"অন্তরে যারা দীন, তারা ধন্য-স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
দুঃখে-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা-তারই পাবে সান্ত্বনা।
বিনীয় কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা-প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।
ধার্মিকতার দাবি পুরণের জন্যে তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা-তারাই পরিতৃপ্ত হবে। দয়ালু যারা, ধন্য তারা-তাদেরই দয়া করা হবে।
অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা-তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে। শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা-তারাই পরশ্বেরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা-স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
আর ধন্য তোমরা, আমার জন্যে লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন আনন্দ করো, উল্লাস করো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার। তোমাদের আগেকার প্রবক্তারাও তো ঠিক একই ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন" [মথি ৫ঃ৩-১২ পদ]

**পবিত্র বাইবেলে আরো উল্লেখ আছে ঃ** যিশুর অনুসারীদের চালচলন আচার-ব্যবহার এবং প্রভুর বাণী প্রচারে উদ্যম ও উৎসাহ দেখে তাদেরকে আন্তিয়োখ নগরীতেই প্রথম খ্রিস্টান নামে অভিহিত করা হয়। [প্রেরিত ১১ঃ১৬]

**প্রার্থনার ও উপবাসের প্রয়োজনীয়তা ঃ** প্রার্থনা হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ বা কথোপকথন। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ ও গভীর

সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। প্রার্থনা কেমন হওয়া উচিত এবং কেমন করে প্রার্থনা করতে হয় সে সম্বন্ধে প্রভু যিশু নিজেই আমাদের শিখিয়েছেন। উপবাস হলো ত্যাগ স্বীকার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির উপায়। এর দ্বারা আমরা অন্তরের পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের সান্নিদ্ধ লাভের উপায় খুঁজে তার প্রিয় সন্তান হয়ে উঠি। এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে যিশুর নির্দেশ সুস্পষ্ট।

**প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা :** তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভন্ডদের মতো তা করো না। তারা যত সমাজগৃহে আর চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যাতে তারা সকলের নজরে পড়ে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরষ্কার তারা সকলের নজরে পড়ে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরষ্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমাদের নিজেই ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকেই ডাক, সেই গোপনেই থাকেন যিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরষ্কৃতই করবেন। প্রার্থনা সময় তোমরা বিধর্মীদের মতো অযথা বেশি কথা বলো না। কারণ তারা মনে করে যে, কথার জোরেই তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। না, তাদের মত হয়ো না, কারণ তোমরা কিছু চাইবার আগেই তোমাদের পরম পিতা জানেন তোমাদের কী কী প্রয়োজন আছে। তাই তোমাদের এইভাবে প্রার্থনা করা উচিতঃ হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি মর্ত্যেও পূর্ণ হোক। আজকের অন্ন আজই আমাদের দান কর। আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিওনা, বরং সেই মহা অসত্যের হাত থেকে আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর। [মথি ৬ঃ৫-১৪ পদ]

**মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য :** মানব সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় রয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব তার নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষের দ্বারাই তিনি তার পরিকল্পনা পূর্ণ করেন। একমাত্র মানুষকেই তিনি বেছে নিয়েছেন সৃষ্ট সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করতে এবং নিজের ও অপরের কল্যাণে তা ব্যবহার করতে। মানুষকে এত মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করার আর একটি উদ্দেশ্য হলো সে যেন ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করে। সেজন্য মানুষ পেয়েছে একটি মর্যাদাপূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব। অতএব, সর্বসত্তা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করা, তাকে জানা এবং তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

**ঈশ্বরের ভালবাসার উপলব্ধি :** যিশু তখন তাদের কাছে এসে বললেন- স্বর্গ ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের

দীক্ষাস্নাত কর। তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে শিখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি" [মথি ২৮ঃ১৮-২০]। সাধু পল বলেন "তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমরা সর্বদাই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা পরমেশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই; কারণ খ্রিষ্ট-যিশুর প্রতি তোমাদের যে কতখানি বিশ্বাস আর সকল ভক্তের প্রতি তোমাদের যে কতখানি ভালবাসা, সে কথা আমরা শুনেছি। স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে যা সঞ্চিত রয়েছে, তা পাবার আশাই তোমাদের এই বিশ্বাস ও ভালবাসাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই আশার বার্তা তোমরা আসলে সেই তখনই শুনতে পেয়েছিলে, যখন মঙ্গল সমাচারের সত্যময় বানী তোমাদের কাছে প্রথম এসেছিল। মঙ্গলসমাচার এখন সারা জগতে ফলশালী হয়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে ঠিক যেমনটি তোমাদের মধ্যেও সেই দিন থেকেই চলে এসেছে, যেদিন তোমরা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের কথা প্রথম শুনতে পেয়েছিলে এবং তার যথার্থ স্বরূপ বুঝতেও পেরেছিলে। তখন এই ব্যাপারে তোমাদের শিক্ষাগুরু খ্রিষ্টের এক বিশ্বস্ত সেবাকর্মী। তাঁরই কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি তোমারে অন্তরে স্বয়ং পবিত্র আত্মা কত গভীর ভালবাসাইনা জাগিয়ে তুলেছেন"। (কলসীয় ১ ঃ ১-৮)

**জীব সাক্ষ্য ঃ** "তাই প্রভুর নামে আমি তোমাদের বলছি, জোর দিয়েই বলছি; তোমরা আর বিধর্মীদের মতো জীবন যাপন করো না- তারা শুধুমাত্র অসার ধ্যান-ধারণায় চালিত। তাদের মনটা তো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে; তাদের মধ্যে এমনই অজ্ঞতা রয়েছে, তাদের হৃদয়টা এমনই কঠিন যে, তারা ঐশ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। তাদের বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে এমনই গা ভাসিয়েছে তারা যে, অশুচি যত কাজ করতে তারা সর্বদা লোলুপ হয়ে আছে। খ্রিস্টের শিষ্য হয়ে তোমরা তো সেইভাবে চলতে শেখোনি- অবশ্য তোমরা যদি সত্যই তাঁরই কথা শুনে থাক- যে সত্য যিশুতেই নিহিত, তাঁর সেই সত্যেরই মন্ত্রে যদি তোমরা দীক্ষিত হয়ে থাক। তোমরা তো এই শিক্ষাই পেয়েছ যে, তোমাদের আগেকার জীবনযাত্রা ছেড়ে দিতে হবে; জীর্ণ পোশাকের মতোই পরিত্যাগ করতে হবে তোমাদের সেই পুরনো মানুষটাকে, মোহময় কামনায় ক্ষয়িষ্ণু সেই মানুষটিকে, যে-মানুষ সৃষ্ট হয়েছে ঐশ প্রতিরূপে, সত্যের প্রভাবে ধর্মিষ্ট ও পবিত্র এক সৃষ্টিরূপে।

"তাই বলছি, মিথ্যাকে বর্জন করে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথাই বল; কেন না পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই মতো। তোমরা ক্রুদ্ধ হলেও পাপ করো না যেন। দেখো, এমনটি যেন না হয়ঃ তোমরা রুষ্ট হয়েই আছ, এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। শয়তানকে কিছু করার সুযোগ তোমরা দিও না! চুরি করা যার স্বভাব, সে যেন চুরি না করে; সে বরং কাজ করুক, নিজের দু'টো হাত

দিয়ে সে বরং ভাল কিছুই করুক, তাহলে সে তো তার নিজের থেকে অভাবী মানুষদেরও কিছু না কিছু ভাগ দিতে পাবে। তোমাদের মুখ থেকে যেন কখনো কোন খারাপ কথাবার্তা না বেরোয়; বরং মানুষের যা ভাল করতে পারে, প্রয়োজন মতো গঠনমূলক কোন কিছু করতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বলো, যাতে যারা শুনছে তাদের যেন কিছু উপকার হয়।

আর একটা কথা ঃ ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মা যিনি, তাঁকে তোমরা কখনো দুঃখ দিয়ো না। তোমাদের অন্তরে তিনি তো সেই ঐশী যে মুদ্রাঙ্কনে তোমরা চিহ্নিত হয়েছ পূর্ণ মুক্তি লাভের সে দিনটির জন্যে। তোমার মধ্যে কোন তিক্ততা, কোন রোষ-আক্রোশ রেখো না; কোন কটু কথা, কোন ক্রুদ্ধ চিৎকার, কোন রকম অনিষ্ট কামনা আর নয়। তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রিষ্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন। (ইফসীয় ৪ ঃ ১৭-৩২)

"তোমাদের কথা মনে পড়লেই আমি আমার ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই; আর সব সময়ে, তোমাদের সকলের জন্যে  যখনই আমি তাকে ডাকি, তখনই সেই প্রার্থনায় আমি একটা আনন্দ অনুভব করি; কেননা মঙ্গলসমাচার প্রচারের কাছে তোমরা প্রথম থেকে আজও পর্যন্ত আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেই আসছ। আর আমি তো এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে যে, তোমাদের অন্তরে যিনি এই শুভ কাজটি শুরু করেছেন, তিনি নিজেই খ্রিষ্ট-যিশুর সেই মহা দিনটি পর্যন্ত তা করে গিয়ে সুসম্পন্ন করে তুলবেন।

তোমাদের সকলের সম্বন্ধে আমার এ ধরনের মনোভাব থাকাটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়; তোমরা তো সর্বদা আমার হৃদয় জুড়েই রয়েছো; কেননা আমি কারাগারেই পড়ে থাকি, কিংবা মঙ্গল সমাচারের সপক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে তার সত্যতা প্রতিপন্নই করে থাকি, যে অবস্থাই থাক না কেন, তখন তোমরা সকলেই তো আমার সঙ্গে একই ঐশ অনুগ্রহের অংশীদার হয়ে থাক। পরমেশ্বর আমার সাক্ষী যে, তোমাদের আমি একান্তভাবেই কাছে পেতে চাই; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশুর স্নেহ নিয়েই তোমাদের কাছে পেতে চাই। আর আমি এই প্রার্থনাও করি যে, তোমাদের ভালবাসা যেন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠে আর সেই সঙ্গে তোমরা যেন সত্যিকার জ্ঞান ও পরিণত বোধশক্তিও লাভ করতে পার। যাতে তোমরা, যা কিছু শ্রেয়, তা যেন চিনে নিতে পার। তাতেই তোমরা অমলিন অনিন্দনীয় হয়ে খ্রিষ্টের সেই মহাদিনটির জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবে; তোমাদের অন্তর ভরে থাকবে ধার্মিকতার সেই ফসলের, স্বয়ং যীশু খ্রিষ্টই যা ফলিয়ে তোলেন, যাতে বিরাজিত হয় পরমেশ্বরের মহিমা, ধ্বনিত হয় তাঁর স্তুতিবন্দনা"। [ফিলিপীয় ১ঃ৩-১১]

# বৌদ্ধ ধর্ম

চিত্র ঃ প্যাগোডা

**বন্দনা ও প্রার্থনা ঃ** বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী, তাই বলে জ্ঞানী মাত্রই বুদ্ধ নন, কেবল তাকেই বুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয় যিনি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা-ত্রিলক্ষণযুক্ত জগতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, যিনি দুঃখ সমুদয়, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ, দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে প্রবুদ্ধ হয়েছেন এবং যিনি কামাদি রিপুনিচয় বা অরিসমূহকে জয় করে অরিন্দম হয়েছেন।

বিশেষ অর্থে আমরা বুদ্ধ বলতে শাক্যরাজ শুদ্ধোদন পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমকেই বুঝি যিনি ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধ হলেন এবং পরবর্তী ৪৫ বছর ধরে বিস্তীর্ণ এলাকা, পথে জনপদে, গ্রামে গঞ্জে তার সাধনার ফল ধর্ম প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে মল্লরাজ্যের অন্তর্গত কুশীনগরের যমক শালবৃক্ষের নিচে নির্বান লাভ করেন।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক। এই ধর্মগ্রন্থ তিনভাগে বিভক্ত। যথা ১. বিনয় পিটক, ২. সূত্র পিটক ৩. অভিধম্ম পিটক। যে কোন সমস্যার সমাধানে এই ধর্মীয় গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হয়।

**ধর্মীয় উৎসব ও পার্বন ঃ** উপোসথ, বর্ষাবাস, প্রবারণা, কঠিন চীবর দান, প্রবজ্যা ও শ্রমনের প্রবজ্যা, ভিক্ষু উপম্পদা। বৌদ্ধদের কাছে প্রত্যেক পূর্ণিমাই উৎসবের দিন, বিশেষত বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা দিবসে বৌদ্ধ নরনারীগণ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে।

বৌদ্ধরা তিনটি নিয়ম মেনে চলে। তাহলো সকালে পুষ্পপূজা, দুপুরে আহার পূজা, বিকেলে প্রদীপ পূজা। প্রাত্যহিক নিয়মে বৌদ্ধরা খুব ভোরবেলা মুখ হাত ধুয়ে পুষ্পপূজা করে। তারপর দুপুর ১২টার মধ্যে নিজের আহার গ্রহণের আগে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আহার পূজা ও বিকেলে প্রদীপ পূজা করে থাকে। এই তিনটি পূজা দেওয়ার সময় সাধারণত ঃ ত্রিরত্ন বন্দনা করে থাকে।

**১. বুদ্ধ বন্দনা ঃ**

বুদ্ধ সুসুদ্ধো করুণা মহন্নবো
যো চ্চন্ত সুমুদ্ধবর এ্রান লোচনো,
লোকস্স পাপুপকিলোস সাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেন তং।

এর তাৎপর্য হলো যিনি বুদ্ধ সুশুদ্ধ করুণা, মহার্ণব ও অত্যন্ত শুদ্ধবর জ্ঞানলোচন এবং যিনি লোকের পার ও উপক্লেশ মাতক, আমি সেই বুদ্ধকে সাদরে বন্দনা করছি।

২. ধর্ম বন্দনা ঃ

ধম্মো পদীপো বিয় তস্স সুত্থুনো
যোগ সগগপাকামত ভেদ ভিন্নকো,
লোকুত্তরো যো-চ তদথ দীপনো ।
বন্দামি ধম্মং ইহমাদরেন তং ।

**অনুবাদ ঃ** সেই জগদগুরু ভগবান শাস্তা বুদ্ধের যেই ধর্ম প্রদীপবৎ মার্গ ফল, অমৃতভেদ নির্দেশক, যে ধর্ম পরমার্থ সত্য প্রকাশক, ও ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ আমি সেই ধর্মকে সাদরে বন্দনা করছি ।]

**কঠিন চীবর দান ঃ** প্রতিবছর সমস্ত থেরবাদী দেশ সমূহে এ উৎসবটি সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় । আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস দানক্রিয়া উদ্‌যাপনের সময় । অন্যান্য দানের সাথে এর পার্থক্য এই যে, এ দানক্রিয়া একই বিহারে বছরে একবার মাত্র করা যায় । বছরের অন্যান্য সময় এটা করা যায় না । যে বিহারের কেন ভিক্ষু বর্ষাবাস করেননি সে বিহারে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপিত হতে পারে না ।

যেদিন কঠিন চীবর দেয়া হবে সেদিন অরুণোদয় থেকে পর দিবসের অরুণোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাপড়বুনা, বস্ত্র কর্তন, সেলাই, রঙ করা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কার্য একই দিনে সম্পন্ন করতে হয় বলে একে কঠিন চীবর বলা হয় । কথিত আছে একদা ষড়ভিজ্ঞালাভী পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষু সঙ্গে করে ভগবান বুদ্ধ আকাশ মার্গে হিমালয়ের অনোবতপ্ত হ্রদে গিয়ে উপস্থিত হন । কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করার জন্য আদেশ করেন । নিম্নে কঠিন চীবর দানের ফলে জন্মজন্মান্তরে বহু সুখ উপভোগের বিবরণে নাগিত স্থবির বলেন ।

১. আজ থেকে ত্রিশ কল্প পূর্বে গুণোত্তমক সংঘকে কঠিন চীবর দান করে এযাবৎ কোন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিনি ।
২. আমি আঠার কল্প দেবলোকে দিব্যসুখ উপভোগ করেছি । চৌত্রিশ বার দেব রাজা ইন্দ্র হয়ে দেবলোক শাসন করেছি ।
৩. আমি মধ্যে মধ্যে রাজচক্রবর্তী সুখ লাভ করেছি । যেখানেই জন্মগ্রহণ করেছি সেখানেই সর্ব-সম্পদের অধিকারী হয়েছি । কোথাও আমার ভোগ সম্পদের অভাব হয়নি । কঠিন চীবর দানের এটাই ফল ।
৪. আমি সহস্রবার ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্ম হয়েছি, কোন সময় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও মহাপ্রভাবশালী ধনী গৃহে জন্মলাভ করেছি ।

**প্রবারণা ঃ** প্রবারণা শব্দের অর্থ আমার তৃপ্তি অভিলাষ পূরণ শিক্ষা সমাপ্তি বা ধ্যানে শিক্ষা সমাপ্তি বোঝায়। বর্ষাব্রত পূর্ণ হবার দিনে আশ্বিনী পূর্ণিমার উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভিক্ষুদের চেয়ে গৃহী উপাসক উপাসিকরাই এতে বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করে। প্রবারণা পূর্ণিমাতে সাধারণত সকল বৌদ্ধ নর নারীগণ মিলিত হয়ে তাদের সারাবছরের কৃতকর্মের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা চায় যাতে ইহলোকে পরলোকে সুখে জীবন অতিবাহিত হয়।

উপরে উল্লিখিত উৎসব ও অনুষ্ঠান ছাড়া আরও বহু প্রকার উৎসব, পার্বণ বৌদ্ধগণ পালন করে থাকেন, তার মধ্যে নববর্ষ ধাতুপূজা সূত্রপাঠ, প্রদীপ পূজা, সীবলী পূজা, ভিক্ষুদের দাহক্রিয়া, নবান্ন, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, সংঘ দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদের কাছে প্রত্যেক পূর্ণিমাই উৎসবের দিন। বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ সংগঠিত হয়, এ জন্যে বৌদ্ধরা বৈশাখী পূর্ণিমাকে সবচাইতে বড় পূর্ণিমা মনে করে।

## স্কাউটস ওন

স্কাউটস ওন স্কাউটদের একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান। মূলত স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করার জন্য এ অনুষ্ঠান। এটি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বা ধর্মের কোন বিকল্প নয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করা হয়। তাঁদের ঘটনাবহুল জীবনের সাথে স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার মিল রয়েছে, এমন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এতে স্কাউটগণ বুঝতে পারে যে, সকল ধর্মের মনীষীগণের জীবনের সাথে স্কাউটিং এর অপূর্ব মিল রয়েছে। স্কাউট ইউনিটে বছরে ২/১ বার স্কাউটস ওন এর ব্যবস্থা করা যায়।

সাবধানতা ঃ

* পরিবেশ অনাড়ম্বর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে।
* কোন মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা কোন অবস্থায় যাতে বিভ্রান্তিকর না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
* ভুল তথ্য কোন অবস্থায় পরিবেশন করা যাবেনা।
* সকল ধর্মীয় মনীষীগনের জীবনের সত্য ঘটনা তুলে ধরতে হবে।
* পূর্বাহ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মহড়া দিতে হবে।

* উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয় যেন প্রতিজ্ঞা ও আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

**উপকরণ ঃ**

বসার প্রয়োজনীয় জিনিস পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করতে হবে।

* প্রয়োজনীয় সুগন্ধি, ফুল, ফুলদানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
*

**উপসংহার ঃ**

অতিরিক্ত কিছু না করে ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্কাউট বয়সী বালক / বালিকাদের

* উপযোগী করে স্কাউটস ওন এর আয়োজন করতে হবে । গ্রুপ কমিটি সদস্য
* ও ২/১ জন অভিজ্ঞ মুরব্বিকে দাওয়াত করা যেতে পারে।
* স্কাউটস ওন এক থেকে দেড় ঘন্টা সময়ের বেশী হবে না ।
*

**স্কাউটস ওন এর নমুনা কর্মসূচি** তারিখ.....................

| | বিষয় | দায়িত্ব |
|---|---|---|
| * | স্কাউটস ওন এর ব্যাখ্যা ও উদ্বোধন ঘোষণা | ইউনিট লিডার |
| * | পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত | কাক উপদল |
| * | গীতা পাঠ | কোকিল উপদল |
| * | হামদ | কবুতর উপদল |
| * | উপাখ্যান | ঘুঘু উপদল |
| * | নাত | কবুতর উপদল |
| * | উপাখ্যান | কাক উপদল |
| * | স্কাউট আইন পাঠ | প্রশিক্ষক/সহকারী ইউনিট লিডার |
| * | ভক্তিমুলক গান | কোকিল উপদল |
| * | উপাখ্যান | দোয়েল উপদল |
| * | পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ | কবুতর উপদল |
| * | উপাখ্যান | কাক উপদল |
| * | কির্তন | কোকিল উপদল |
| * | প্রতিজ্ঞা পুনঃপাঠ | ইউনিট লিডার |
| * | স্কাউটস ওন এর মূল্যায়ন | ইউনিট লিডার |
| * | নিরব প্রার্থনা | ইউনিট লিডার |

# স্কাউট দক্ষতা

**দড়ির কাজ ঃ**

সদস্য ব্যাজে তোমরা দড়ির যত্ন, হুইপিং, থাম্ব নট, রীফ নট, ক্লোভহিচ ও বোলাইন শিখেছ। এবার তোমাকে ল্যাশিং শিখতে হবে। দু'তিনটা লাঠি বা বাঁশ শক্ত করে এক সঙ্গে বাঁধতে হলে দড়ির কতগুলো বিশেষ প্যাঁচ দরকার। এ প্যাঁচকে ল্যাশিং বলে। সাধারণত পুল, ঘর, মাচান বা গ্যাজেট তৈরি করার সময় ল্যাশিংয়ের ব্যবহার করা হয়। স্কাউট স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জনের জন্য গেরোর পাশাপাশি যে দু'টি ল্যাশিং শিখতে হয় তাদের নাম স্কয়ার ল্যাশিং ও ডায়াগোনাল ল্যাশিং।

**১. ওয়ান রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস (ONE ROUND TURN AND TWO HALF HITCHES) বা তাঁবু গেরো ঃ** দড়ির চলমান অংশ দিয়ে কোন খুঁটিতে দু'বার প্যাঁচ দাও । খুঁটিতে দু'বার প্যাঁচ দেয়ার পরে দড়ির দু প্রান্তকে দু হাতে ধরলে তা হবে একটি পূর্ন প্যাঁচ বা একটি টার্ন। এবার দড়ির চলমান প্রান্তদিয়ে দড়ির স্থির অংশের অল্প দূরে দূরে দু'টি হাফ হিচ দাও । এভাবে রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস বা তাঁবু গেরো (ROUND TURN AND TWO HALF HITCHES) বাঁধতে হয়।

তাঁবুর পেগের সাথে তাঁবুর গাই লাইন বা গাই রোপ বাঁধার জন্য এই হিচ ব্যবহার করা হয়।

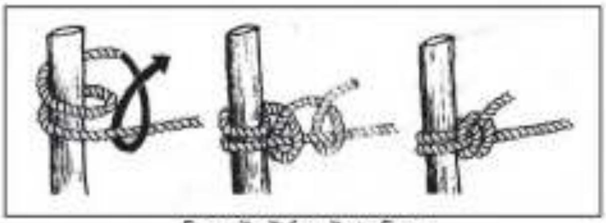

চিত্র ঃ রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস

**অনুশীলন ঃ** যখনই সুযোগ আসে, তখনই গেরো বাঁধার চেষ্টা করে গেরোগুলোকে চর্চা করা যায় ও মনে রাখা যায়।

**২. শিট বেন্ড (SHEET BEND) বা পাল গেরো ঃ** একটি দড়ির এক প্রান্তে লুপ করে বাম হাতে ধর। এবার ডান হাতে একটি সরু দড়ির প্রান্তভাগ মোটা

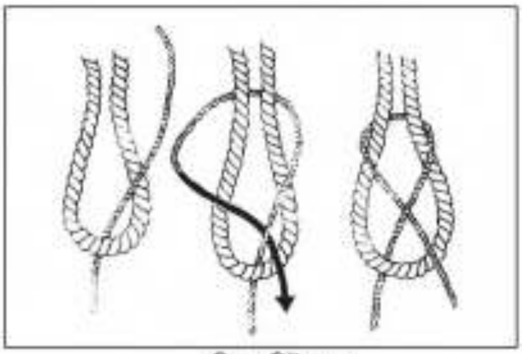

*চিত্র ঃ শিট বেন্ড*

লুপের নিচের দিক থেকে উপরে তোল । তার পর মোটা দড়ির সাথে প্যাঁচ দিয়ে সরু দড়িটিকে তার নিচের লুপের মূল অংশের নিচে ঢুকিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখতে হবে এ সময় সরু দড়ির প্রান্তটি যেন লুপের ওপরে থাকে। এরপর সরু দড়ির স্থির অংশকে আস্তে আস্তে টানলে শিটব্যান্ড বা পাল গেরো তৈরি হয়ে যাবে । এইভাবে শিটবেন্ড বা পাল গেরো বাধঁতে হয়। মোটা দড়ির সাথে সরু দড়ি বাঁধতে, নৌকার পাল বাধঁতে, পতাকার রশি ও পতাকাদন্ডের রশি একত্রে বাঁধতে এই গেরো ব্যবহৃত হয় ।

**৩. টিম্বার হিচ (TIMBER HITCH) বা গুড়ি টানা গেরোঃ** দড়ির অংশ দিয়ে গাছের গুড়ি বা অন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে একবার প্যাঁচ দাও। এভাবে হাফ হিচ দেওয়া শেষ হলে দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে মূল দড়ির অংশে অন্ততপক্ষে ৫-৭ বার প্যাঁচিয়ে দাও। এভাবে টিম্বার হিচ বা গুড়ি টানা গেরো বাঁধতে হয়। চিত্রঃ (ক ও খ অনুযায়ী) কেলিক দিয়ে বস্তুটিকে সোজা রাখা হয় যাতে সে অল্প জায়গা নিয়ে যেতে পারে।

*চিত্র: ক*

*চিত্র: খ*

যদি কোন লম্বা বস্তুকে টেনে আনার জন্য টিম্বার হিচ বা গুড়ি টানা গেরো ব্যবহার করতে হয়। তাহলে সেই বস্তুর সাথে প্রথমে টিম্বার হিচ বা গুড়ি টানা গেরো বেঁধে তারপর একটি লুপ তৈরি করে ঐ লুপটি তার সামনে অংশে ঢুকিয়ে দাও। এই লুপকে

কেলিক বলে। (খ চিত্র অনুযায়ী) কোন বোঝা বা ভারি গাছের টুকরো টেনে আনার জন্য টিম্বার হিচ ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাঁধার আগে এই হিচ দিয়ে দিয়ে ল্যাশিং শুরু করতে হয়।

### ৪. স্কয়ার ল্যাশিং (SQUARE LASHING)

একটি বাঁশ বা দণ্ডকে মাটির ওপর খাড়াভাবে রাখ। এভাবে প্রথম বাঁশ বা দণ্ডটি রেখে অন্য একটি বাঁশ বা দণ্ডকে আগের বাঁশ বা দণ্ডের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখ। যে বাঁশ বা দণ্ডকে মাটির ওপর খাড়াভাবে রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'পোল' এবং পোলের ওপরে যে বাঁশ বা দণ্ডকে আড়াআড়িভাবে রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'বার'।

এবার 'পোল' এবং 'বার' যেখানে মিলিত হয়েছে তার নিচের অংশের পোলে একটি ক্লোভ হিচ বা বঁড়শি গেরো বাঁধ। এবার ঐ দড়ির চলমান অংশকে 'বারের' ওপর দিয়ে 'পোলকে' পিছন দিক থেকে প্যাঁচিয়ে আবার 'বারের' ওপর রাখ। এরপর দড়ির চলমান অংশকে আবার পোলকে' পিছন দিক থেকে প্যাঁচিয়ে আবার বারের ওপর রাখ। এভাবে অন্তত্পক্ষে ৩-৫ বার আগের বর্ণনা অনুযায়ী দড়ির চলমান অংশ দিয়ে 'পোল' এবং 'বারকে' জড়িয়ে প্যাঁচাতে হবে। 'পোলকে' প্যাঁচানোর সময় দড়িকে 'পোলের' নিচে এবং ওপরের প্রথমে যে দু'টি প্যাঁচ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী প্যাঁচগুলো এই দু'টির মধ্যে রাখতে হবে, যাতে আস্তে আস্তে 'পোলের' এই অংশের ফাঁক বন্ধ হয়ে যায়। বর্ণনা অনুযায়ী 'পোল' এবং 'বারকে' ৩- ৫ বার প্যাঁচান শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে 'পোল' এবং 'বারের' মাঝে যে দড়ি আছে তাকে শক্ত করে অন্তত্পক্ষে ৩-৪ বার পেঁচিয়ে যাও। দড়ির এই অংশকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানকে ফ্র্যাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্র্যাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত বা শক্ত হবে।

ফ্র্যাপিং দেওয়া শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে 'বারে' ক্লোভ হিচ বা বঁড়শি গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ কর। এভাবে স্কয়ার ল্যাশিং বাঁধতে হয়। মাটির ওপর খাড়াভাবে রাখা একটি বাঁশ বা দণ্ডকে তার ওপর আড়াআড়িভাবে বা প্রায় আড়াআড়িভাবে রাখা অপর একটি বাঁশ বা দণ্ডকে বাঁধার জন্য স্কয়ার ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। (নিম্নের চিত্র অনুযায়ী)।

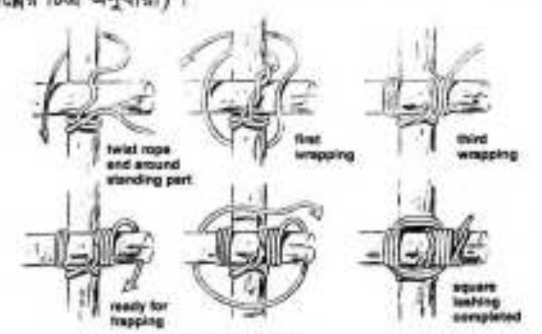

SQUARE LASHING

## ৫. ডায়াগোনাল ল্যাশিং (DIAGONAL LASHING)

একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দণ্ডের ওপর কোণাকুণিভাবে বা প্রায় কোণাকুণিভাবে (গুণন চিহ্নের মত) অবস্থায় রাখ। এভাবে রাখার ফলে দুটি বাঁশ বা দণ্ড যেখানে মিলবে সেখানে দুটি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে একটি টিম্বার হিচ (TIMBER HITCH) বা গুঁড়ি টানা গেরো বাঁধ। এবার দড়ির চলমান অংশের দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ দড়ির চলমান অংশকে বাইরের দিকে নিয়ে দুই বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে ৫-৭ বার প্যাঁচ দাও। এরপর যে দিক থেকে আগে প্যাঁচিয়েছ তার উল্টা দিক থেকে বাঁশ দুটোকে একত্র করে আগের মত ৫-৭ বার প্যাঁচ দাও। এভাবে দু'দিক দিয়ে প্যাঁচান শেষ হলে বাঁশ বা দণ্ডের মাঝে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৩-৪ বার প্যাঁচ বা ফ্রাপিং দাও।

ফ্র্যাপিং দেওয়া শেষ হলে যে কোন একটি বাঁশ বা দণ্ডের সঙ্গে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে ক্লোভ হিচ বেঁধে ল্যাশিং শেষ কর। এভাবে ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাঁধতে হয় (নিম্নের চিত্র অনুযায়ী)।

DIAGONAL LASHING

**অনুশীলনঃ** একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দণ্ডের উপর কোণাকুণিভাবে বা প্রায় কোণাকুণিভাবে রেখে বাঁধার জন্য ডায়াগোনাল ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

সংকেত ঃ

## বাঁশির ডাক ও হস্ত সংকেত

**বাঁশীর ডাক ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ———— | একটি দীর্ঘ ধ্বনী<br>চুপকর/সতর্ক হও/পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হও। |
| ২। | ............... | অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনী-<br>সকলে একত্রিত হও/কাছে এসো |
| ৩। | - - - —— | তিনটি ক্ষুদ্র এবং একটি দীর্ঘ ধ্বনী<br>উপদল নেতাকে ডাকা হচ্ছে/উপদল নেতা কাছে এসো |
| ৪। | - - —— | দুটি ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘধ্বনী<br>সিনিয়র উপদল নেতাকে ডাকা হচ্ছে। সিনিয়র উপদল নেতা/সেবক উপদল নেতা এসো। |
| ৫। | -—-—-— | একটি ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ এভাবে কয়েকবার<br>বিপদ সংকেত |
| ৬। | ———— | পর্যায়ক্রমে প্রলম্বিত ধীর আওয়াজ<br>সংকেতকারী বিপদ গ্রস্থ তার সাহায্য প্রয়োজন। |
| ৭। | — — — | পরপর কয়েকটি দীর্ঘ ধ্বনি হলে তোমরা বিপদ গ্রস্থ/পালাও। |

## হস্ত সংকেত ও ছবি

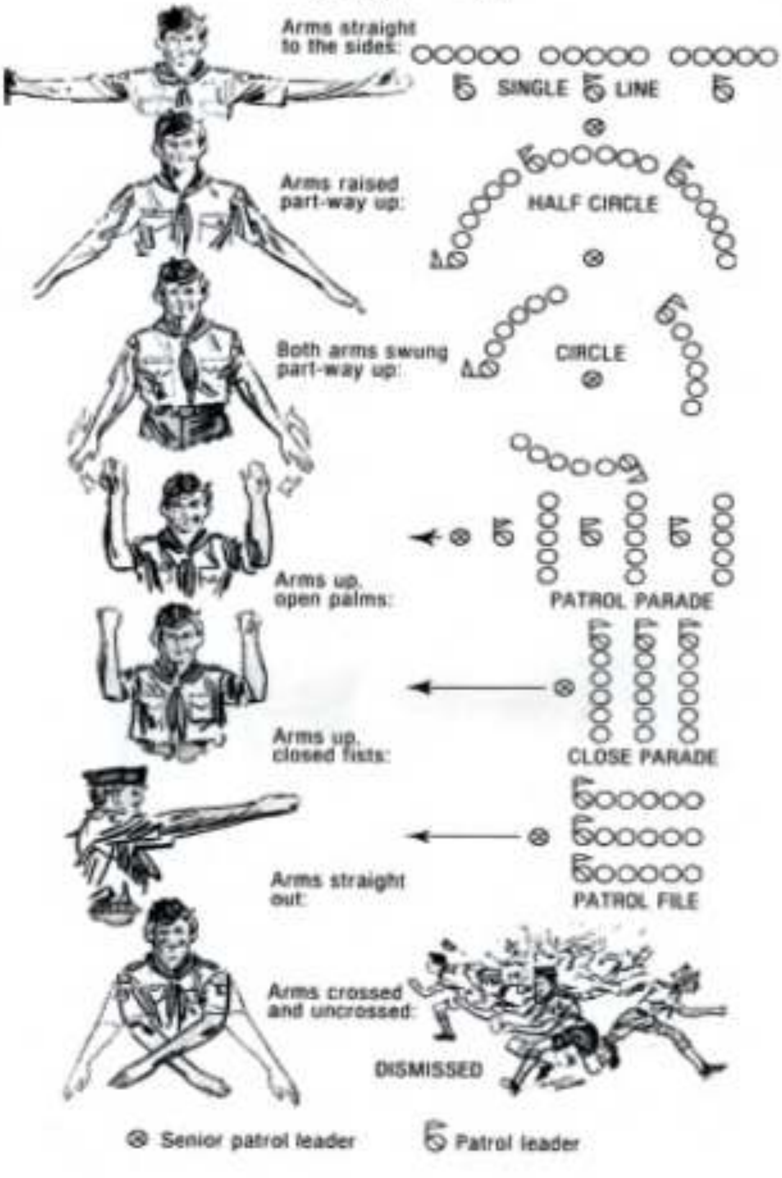

Arms straight to the sides:
SINGLE LINE
Arms raised part-way up:
HALF CIRCLE
Both arms swung part-way up:
CIRCLE
Arms up, open palms:
PATROL PARADE
Arms up, closed fists:
CLOSE PARADE
Arms straight out:
PATROL FILE
Arms crossed and uncrossed:
DISMISSED
Senior patrol leader
Patrol leader

## অভিযান

ইংরেজি এক্সপ্লোরেশন কথাটির বাংলা অর্থ অভিযান। অভিযান বলতে কি বোঝায়? স্কাউটিং করতে হলে তোমাকে নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন পরিবেশে গিয়ে থাকতে হবে। সেখানে গিয়ে অথবা যাবার সময় বা রওনা হবার আগেই তোমাকে খোঁজ নিতে হবে জায়গাটা কি রকম, কোথায় ডাকঘর আছে, কোথায় হাসপাতাল আছে, কোথায় বাজার আছে, কোথায় পানি পাওয়া যাবে, রাস্তাঘাট কি রকম ইত্যাদি। এছাড়া রাস্তায় কোথায় তুমি কি দেখেছ, কোন বৈচিত্র্যপূর্ণ বা দর্শনীয় কিছু আছে কি না ইত্যাদিও জানা দরকার। জায়গাটির এবং রাস্তার একটি নকশা তোমাকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে।

অভিযান তিন উপায়ে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে, যেমন প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণ (গন্তব্য স্থান ও পথ জানা থাকে), পায়ে হাঁটা এবং পথের চিহ্ন।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজের অভিযানকারী হিসেবে একজন নতুন স্কাউটকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে দিনের বেলায় মোট ৬ কি. মি. পথ স্কাউট নেতার দেওয়া পরিকল্পনা মত গিয়ে ফিরে আসতে হবে। ফিরে এসে স্কাউট নেতার কাছে মৌখিক বা লিখিত রিপোর্ট দিতে হবে। লিখিত রিপোর্টের সঙ্গে একটি নকশা থাকলে ভাল হয়। তোমার রিপোর্টে থাকতে হবে রওয়ানার জায়গা ও সময়, পথে চোখে পড়ার মত চিহ্ন, কোন ঘটনা যদি ঘটে থাকে, গন্তব্যে পৌঁছে সেখানকার জন্য দেওয়া কাজকর্মের বিবরণ ইত্যাদি।

❑ **স্কাউট কদমে/চলার কৌশলঃ** স্কাউট হাঁটে না, দৌড়ায়। অর্থাৎ স্কাউট কর্মকাণ্ড অধিক দক্ষতা, দ্রুততা ও সততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়। স্কাউট কদমে মোটামুটি ১২ মিনিটে সোয়া এক কিলোমিটার পথ পার হওয়া যায়। বিশ কদম হাঁটা ও বিশ কদম দৌড়ানোর পর আবার বিশ কদম হাঁটা ও বিশ কদম দৌড়ানো-এভাবে চলাকে স্কাউট কদম বলে। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হলে স্কাউট কদম সবচেয়ে সহজ চলার পদ্ধতি।

❑ উপদল বা দলের একজন স্কাউটের সাথে দিনের বেলায় রুট অনুসরন করে ৫ কিঃমিঃ যাওয়া। ফেরত এসে সে সম্পর্কে লিখিত বা মৌখিক রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। রিপোর্ট লেখা বা উপস্থাপনের সময় যা যা উপস্থাপন করতে হবে সেগুলো হলো ঃ সঙ্গী, সঙ্গীর দায়িত্ব, যাত্রা সময়, আবহাওয়া, চলার পথে ডান- বাম দিকে কি কি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য দেখা গেল। কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলোচনা, গন্তব্য স্থানে পৌঁছার সময়, মন্তব্য ইত্যাদি।

# অনুসরক চিহ্ন (TRACKING SIGN)

ট্রাকিং অর্থ রেখে যাওয়া চিহ্ন ধরে অগ্রসর হওয়া। স্কাউটদের ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস তৈরি  করার প্রাথমিক হাতে খড়ি দেয়া হয় অনুসরক চিহ্ন দিয়ে। স্কাউট হিসেবে তোমরা এগুলো ভালোভাবে দিতে ও পাঠ করতে শিখবে। প্রথমে খোলা ময়দানে, বনে-বাদাড়ে, রাস্তা-ঘাটে, পায়ে চলা পথে ২০ গজ দূরে দূরে রাস্তার ডান ধারে এরূপ অনুসরক চিহ্ন দিয়ে পিছনে খুঁজে বের করা অভ্যাস করবে। ভাল করে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ক্রমে দুরত্ব বাড়াবে এবং পথের দু'দিকে এরকম চিহ্ন ও গোপন ভাষার ইঙ্গিত দেবে যা দলের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। দরকার মতো তোমরা তোমাদের নিজ নিজ কৌশল তৈরি করে নিতে পার। মনে রাখবে খোলা ময়দানের কাজে অনুসরণ চিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

কয়লা, চুন, কালি, নুড়ি পাথর, গাছের পাতা, ডাল, ঘাস বা ছুরি দিয়ে মাটিতে, পথের ধারে, গাছের গায়ে খোদাই করে বা ঝোপ জঙ্গলে এরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এবার এসো আমরা অনুসরক চিহ্নগুলো জেনে নেই।

- ❑ **এই দিকে যাও ঃ** এই চিহ্ন কাঠ-কয়লা, চক দিয়ে দেয়ালে বা চাকু দিয়ে গাছের ছাল কেটে দেয়া যেতে পারে। মাটিতেও আঁচড় কেটে দেয় যেতে পারে।



- ❑ **এই দিকে যাও ঃ** ঘাসের মাথা একত্রে বেঁধে মাথাটি যে দিকে থাকবে সেদিকে যাওয়ার নির্দেশ থাকবে।



- ❑ **এই দিকে যাও ঃ** কোন গাছের সরু ডাল ভেঙে এই চিহ্ন দেয়া হয়। ডালের সামনের অংশে রাস্তার দিকে নির্দেশ করবে। ডালটি গাছের সাথে সংযুক্ত থাকলে ডালের সম্মুখ ভাগ দিক নির্দেশ করবে।

- **এই দিকে যাও ঃ** একটি পাথরের বা মাটির ঢেলার ওপর একটি ছোট পাথর বা ঢেলা রেখে তার সামনে একটি পাথর বা মাটির ঢেলা রাখলে সামনে রাখা পাথর বা ঢেলা যে দিক নির্দেশ করবে সেই দিকে যেতে হবে।

- **এই দিকে যাও ঃ** কোন গাছের ওপরে একটি চৌকো ঘর চাকু দিয়ে খোদাই করে তার উপর অপেক্ষাকৃত ছোট একটি চৌকো ঘর খোদাই করে যদি নিচের খোদাইকৃত চৌকা ঘরের সামনে আর একটি ঘর খোদাই করা হয় তাহলে সামনের চৌকো ঘর যে দিকে নির্দেশ করবে এই চিহ্ন সেই দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেবে।

- **এই দিকে যেওনা ঃ** কাঠ, কয়লা, চক, চুন ইত্যাদি দিয়ে দেয়া যেতে পারে।

X

- **এই দিকে যেওনা ঃ** ঘাসের মাথা একত্রে বেঁধে মাথার উপরের অংশটি উপরের দিকে রাখলে এ রাস্তা বা ঐ রাস্তায় যেতে মানা এটা মনে রাখতে হবে।

- **এই দিকে যেওনা ঃ** পরস্পর তিনটি পাথর বা মাটির ঢেলা রাখা থাকলে এ রাস্তা বন্ধ বা ঐ রাস্তায় যাওয়া নিষেধ মনে করতে হবে।

- **এই দিকে যেওনা ঃ** কোন গাছের নিচের থেকে ওপরের দিকে বা ওপর থেকে নিচের দিকে পরস্পর তিনটি চৌকো ঘর তৈরি করা হলে এ রাস্তা বন্ধ বা ঐ রাস্তায় যাওয়া নিষেধ মনে করতে হবে।

- **খবর লুকানো আছে ঃ** মাটিতে বা গাছে চাকু দিয়ে একটি চৌকো ঘর তৈরি করে তার মধ্যে কোন সংখ্যা বসাতে হবে। খোদাইকৃত চৌকো ঘরে যে সংখ্যা লেখা থাকবে ঐ চৌকো ঘর থেকে তত কদম দূরে তীর চিহ্নিত দিকে কোন খবর লুকানো আছে। তীর চিহ্ন না দিলে বুঝতে হবে তত কদম পরে যে কোন দিকে খবর লুকানো আছে।

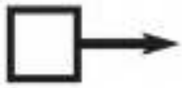

- **খাবার পানি আছে ঃ** মাটিতে বা গাছে একটি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে কয়েকটি ঢেউ চিত্র আঁকলে তীর চিহ্নিত দিকে খাবার পানি আছে বোঝাবে।

- **তাঁবু ঃ** মাটিতে দেওয়ালে বা গাছে একটি ত্রিভুজ এঁকে তার মধ্যে অপর একটি ত্রিভুজ রাখলে তীর চিহ্নিত দিকে তাঁবু আছে বোঝাবে।

- **এখানে অপেক্ষা কর ঃ** মাটিতে বা গাছে একটি চৌকো ঘরের মধ্যে অপর একটি চৌকো ঘর থাকলে বুঝতে হবে এখানে অপেক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে।

- **বাড়ি চলে গেলাম ঃ** মাটিতে বা গাছে চাকু দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করে তার ভেতর আরো ছোট বৃত্ত আঁকা থাকলে বোঝাবে যে, আমি বাড়ি চলে গেছি।

- **খেয়াঘাট আছে ঃ** মাটিতে বা গাছে কয়েকটি ঢেউ এঁকে বা খোদাই করে আড়াআড়ি একটি রেখা টানলে ঐ রেখার দিক খেয়াঘাট নির্দেশ করে। এই চিহ্ন কাঠ-কয়লা, চক দিয়ে বা চাকু দিয়ে গাছের ছাল কেটে দেয়া যেতে পারে। মাটিতেও আচঁড় কেটে দেয়া যেতে পারে।

- **উপদল চিহ্ন ঃ** প্রত্যেক উপদলের পশু বা পাখির মাথা উপদল চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপদলের চিহ্ন শুধু উপদলের সদস্যরাই ব্যবহার করবে।

## কনভেনশনাল সাইন

কনভেনশন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-প্রচলিত/রীতিসিদ্ধ/ প্রথা এবং সাইন শব্দের অর্থ চিহ্ন। সুতরাং কনভেনশনাল সাইন বলতে প্রচলিত চিহ্ন বুঝায়। স্কাউটগণ হাইকিং এর সময় এবং মানচিত্র অঙ্কনকালে এই সকল কন্‌ভেন্‌শনাল্ সাইন ব্যবহার করে থাকে। নিচে বহুল প্রচলিত কতিপয় কন্‌ভেন্‌শনাল্ সাইন তুলে ধরা হলো।

# অনুমান (Estimation)

কোন কিছুকে সরাসরি না মেপে সে সম্বন্ধে আন্দাজ করে বলতে পারাকে অনুমান বলে। তোমাকে স্কাউট পদ্ধতিতে কোন কিছুর দূরত্ব, উচ্চতা, ওজন, পরিমাণ ও সংখ্যা অনুমান করে বের করতে হবে। এগুলো সব সময় নিয়মমত অভ্যাস করতে হবে।

স্কাউট হিসেবে তোমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মাপ-লম্বা, চওড়া, ওজন ইত্যাদি জানা দরকার। তোমার শরীরের উচ্চতা, হাতের (কনুই থেকে মাঝের আঙুলের ডগা পর্যন্ত) মাপ, বিঘৎ, আঙুলের মাপ, লাঠির মাপ, কলমের মাপ ইত্যাদি জানা থাকলে কোন জিনিসের মাপ সম্পর্কে সঠিক অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

নিচে অনুমান করার দু'একটি সাধারণ পদ্ধতি দেয়া হল ঃ

**জ্যামিতিক পদ্ধতি ঃ**

জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে দূরত্ব মাপা যায়। দূরত্ব মাপার জন্য ধরা যাক ক থেকে খ এর দূরত্ব মাপতে হবে। খ নদীর এপার এবং ক ওপারে। খ-এ দাঁড়িয়ে ক-এর দিকে লক্ষ্য কর। ক-এর জায়গায় কোন গাছ বা অন্য কোন স্থির বস্তুকে ঠিক করে নাও।

খ থেকে ডান বা বাঁদিকে সুবিধামত ঘুরে নদীর পাড় দিয়ে এগুতে থাক। ৫০ গজ যাওয়ার পর একটি লাঠি গ স্থানে পুঁতে রাখ। আবার গ থেকে আর ২৫ গজ এগিয়ে ঘ স্থানে আর একটি লাঠি পোঁত। তারপর বাঁ অথবা ডান দিকে (নদীর উল্টা দিকে) সমকোণ ঘুরে সামনের দিকে যাও। এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে যেখানে থেকে গ-এর উপর দিয়ে ক পর্যন্ত বরাবর একটি সরল রেখা টানা যায়। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ তা ঙ। এখন ঙ থেকে ঘ-এর দূরত্ব মাপ। মনে কর ২০০ গজ । একে ২ দিয়ে গুণ করলে খ থেকে ক-এর দূরত্ব পাওয়া যাবে। অর্থাৎ নদীর চওড়ার মাপ বের করা যাবে।

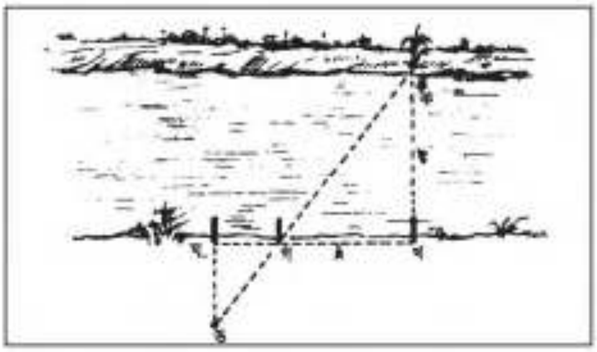

**ইঞ্চি থেকে ফুট ঃ**

উচ্চতা মাপার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে একটি সহজ পদ্ধতি হল 'ইঞ্চি থেকে ফুট' পদ্ধতি।

ধর, কোন একটি গাছের উচ্চতা মাপতে হবে। অর্থাৎ খ থেকে ক পর্যন্ত মাপতে হবে। গাছের মাথাকে 'ক' বল। গাছের গোড়া থেকে সুবিধা মত যে কোন দিকে তোমার স্কাউট লাঠি দিয়ে (লাঠিতে ইঞ্চি, ফুট দাগ থাকা ভাল) ১১ লাঠি মেপে যাও এবং সেখানে একটি কাঠি পোঁত। সেখানে থেকে আরও এক লাঠি মেপে যাও এবং সে জায়গাটি চিহ্নিত কর। একে 'ঙ' বল। এবার পাশ ফিরে মাটিতে শুয়ে উপরের চোখ বন্ধ করে নিচের চোখ দিয়ে দেখ। ঙ থেকে গাছের আগা ক পর্যন্ত মনে মনে একটা লাইন টানলে লাঠির যে জায়গা দিয়ে লাইনটি গেল তাকে ঘ বল। লাঠির গোড়াকে গ বল। এখন গ ঘ-এর উচ্চতা যত ইঞ্চি, গাছের উচ্চতা তত ফুট হবে।

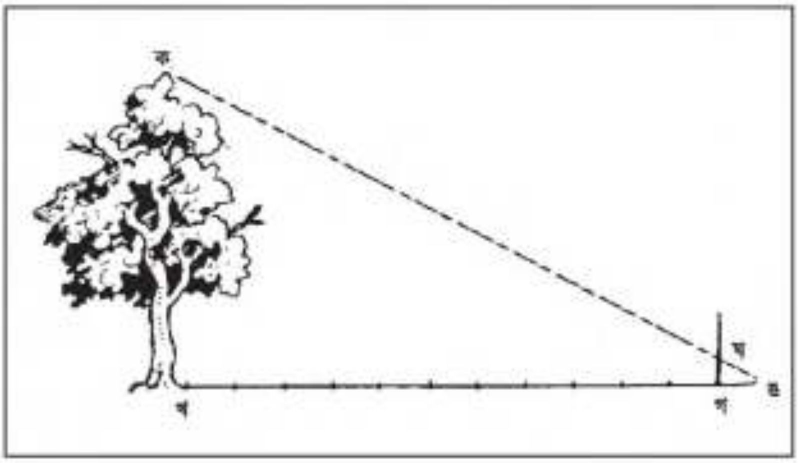


**ছায়া পদ্ধতি**

উচ্চতা মাপার একটি সহজ পদ্ধতি হল ছায়া পদ্ধতি। এটা রোদ থাকলে করা যায়। তোমার লাঠি রোদে খাড়া করে ধর। তারপর এর ছায়া মাপ। মনে কর লাঠি ৩ মিটার আর ছায়া ৬ মিটার। এখন গাছের ছায়ার মাপ মনে কর ৩০ মিটার। এবার সাধারণ ঐকিক নিয়মে গাছের উচ্চতা হবে ঃ

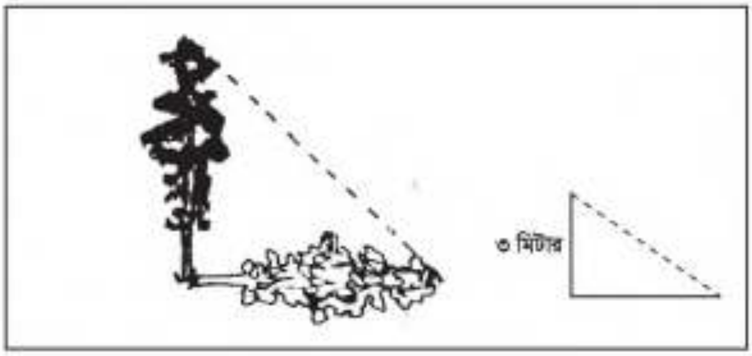


৬ মিটার ছায়া হলে গাছের উচ্চতা = ৩ মিটার

১ " " " " " = $\frac{৩}{৬}$ মিটার

৩০ " " " " " = $\frac{৩০ \times ৩}{৬}$ = ১৫ মিটার

অর্থাৎ গাছের উচ্চতা ১৫ মিটার

পরবর্তী দক্ষতা ব্যাজে দূরত্ব, উচ্চতা, ওজন, সংখ্যা প্রভৃতি বের করার আরও পদ্ধতি জানতে পারবে।

## ওজন অনুমান

একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা খণ্ড হাতে নিয়ে তার ওজন বলতে পার। যেমন ঃ এক কেজি আলু অথবা চাল তোমার হাতে দেওয়া হলো। তুমি কিন্তু জান না এখানে কি পরিমান আলু বা চাল রয়েছে, অনুমান করে বলতে হবে এখানে ৮০০ গ্রাম বা ৯০০ গ্রাম অথবা ১,০০০ গ্রাম আলু বা চাল আছে।

ওজন অনুমানের সহজ উপায়, এক কেজি ওজনের আটা/লবনের প্যাকেট হাতে নাও এবং যে জিনিসটির ওজন অনুমান করতে হবে তাও হাতে নাও। দু' থেকে তিনবার এক হাতে অন্য হাতে পরিবর্তন কর এবং আটা, লবন এর সাথে যে জিনিসটির ওজন পার্থক্য অনুমান করবে তার ওজন তুলনা কর এবং বল।

বিকল্প নিয়ম হতে পারে একটি বলে/বালতির এক তিন অংশ পানি নাও এবং নির্দিষ্ট ওজন কর, একটি বস্তু বা খণ্ড একটি পাতিলের মধ্যে রেখে বালতির পানিতে রাখ, পাতিলে স্পর্শ পানির সীমানা চিহ্নিত কর। আবার ওজন না জানার বস্তু বা খণ্ডটি পুনরায় পাতিলে রাখ এবং বালতির পানিতে রাখ, আগের চিহ্নের সাথে এবারের স্পর্শ চিহ্নের পার্থক্য তুলনা কর এবং ওজন অনুমান করে বল। প্রকৃত ওজনের সাথে অনুমানের সামান্য তারতম্য হতে পারে, তবে নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে তা কমিয়ে আনা সম্ভব।

## শরীর চর্চা ও বিপি পিটি

শরীর সতেজ ও সবল করার সহজ উপায় হল নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা। নিয়মিত শরীরচর্চা দেহে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, যা সমস্ত কোষে খাবার পৌছে দিতে সহায়তা করে। রোজ সকাল বিকাল কিছু না কিছু ব্যায়াম করবে। স্কাউটিং-এ কত গুলো সহজ ব্যায়াম আছে যার জন্য কোন উপকরণের দরকার হয় না। স্কাউটিং আন্দোলনের জনকের নামানুসারে এগুলোকে বি.পি. পি,টি বলা হয়। এরকম ছয়টি ব্যায়াম ও ছবি তোমার জানার জন্য বর্ণিত হল। ব্যায়ামগুলো যথাসম্ভব ধীরে ধীরে করবে।

### ১নং পিটি ঃ

এই পিটি মাথা ও ঘাড়ের জন্য। দুই হাতের তালু ও আঙ্গুল দিয়ে মাথা, মুখ ও ঘাড় কয়েকবার ঘষে নিতে হবে। আস্তে আস্তে গাল ও ঘাড়ের পেশী আঙ্গুল দিয়ে টিপে (মালিশ করে) নিতে হবে।

এই ব্যায়ামের বা পিটির পর চুল আঁচড়াতে হবে এবং দাঁত ব্রাশ করে নাক মুখ ধুয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করে পরবর্তী পিটি ২নং থেকে বাকি ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে করবে।

২নং পিটিঃ

এই পিটি বক্ষ দেশের জন্য। সোজা দাঁড়ান অবস্থা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াও। হাত নিচের দিকে ছড়িয়ে দাও। হাতের তালুর পিঠ এক সঙ্গে হাঁটুর সামনে গিয়ে পড়বে (বুড়ো আঙ্গুল দুটি নিচের দিকে) তখন দম ছাড়ো।

আস্তে আস্তে হাত দুখানি দুপাশ দিয়ে মাথার ওপরে তোল। এই অবস্থায় যথাসম্ভব পিছনে বেঁকে যাও। হাত ওঠাবার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে বড় দম নাও। তারপর আস্তে আস্তে হাত দু'খানি দুপাশ দিয়ে পিছন দিকে নামিয়ে দাও। এ সময় Thanks বলতে পার।

এভাবে এ কাজটি ১২ বার কর।

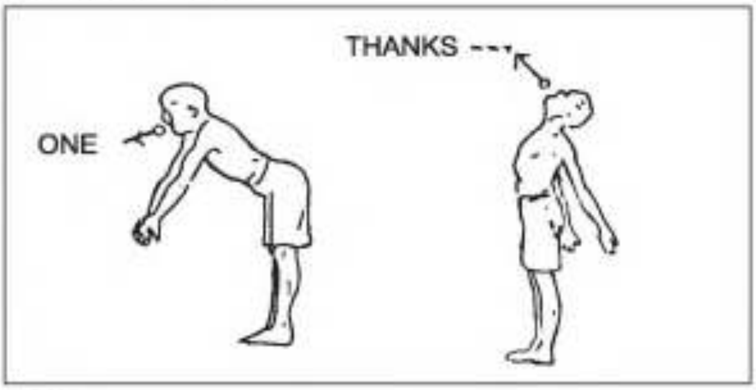


৩নং পিটি ঃ

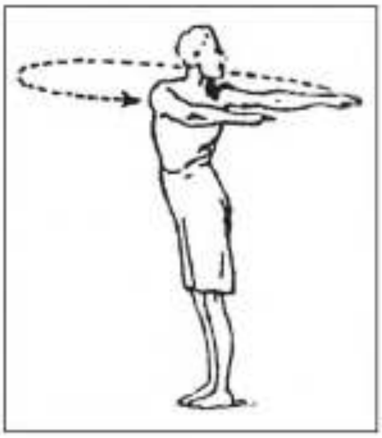

এই পিটি পেটের জন্য। সোজা দাঁড়িয়ে হাত দুটো সামনের দিকে মেলে দাও। হাত খোলা থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে শরীরসহ হাত দুটি ডান দিকে ঘুরিয়ে ফেল। পায়ের পাতা নড়বে না।

ডান হাত যতটুকু পার পিছন দিকে যেতে দাও এবং হাত দু'খানি যথাসম্ভব কাঁধের বরাবর অথবা কাঁধ থেকে একটু উঁচুতে রাখতে চেষ্টা কর। এভাবে দু'এক সেকেণ্ড থেকে আবার আগের মত বাঁদিকে ঘুরিয়ে দাও।

অন্তত ১২ বার এভাবে অভ্যাস কর। এরূপ ব্যায়াম করার সময়ে নাক দিয়ে (মুখ দিয়ে নয়) দম নাও এবং একদিক থেকে অন্য দিকে হাত ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে দম ছাড়। এভাবে পরপর ডান থেকে আরম্ভ করে বাম দিকে ৬ বার ব্যায়াম কর এবং দম ছাড়। তারপর বিপরীত অর্থাৎ বাম দিকে অভ্যাস কর।

**৪নং পিটি ঃ**

এই পিটি কোমর ও শিরদাঁড়ার জন্য। সোজা হয়ে দাঁড়াও। জোড়া করে হাত দুটো মাথার ওপরে তোল। পিছন দিকে যথাসম্ভব শরীর বাঁকিয়ে দুহাত মোচার মত করে শরীরের চারদিকে ঘোরাতে থাক। শরীরটা কেবল একবার বামে, পিছনে, ডানে, সামনে ঘুরে বাঁকবে কিন্তু পায়ের পাতা একটুও নড়বে না। এভাবে প্রথমে বাম দিক থেকে ডান দিকে ৬ বার বাঁকাও, তারপর ডান দিক থেকে বাম দিকে ৬ বার বাঁকাও।

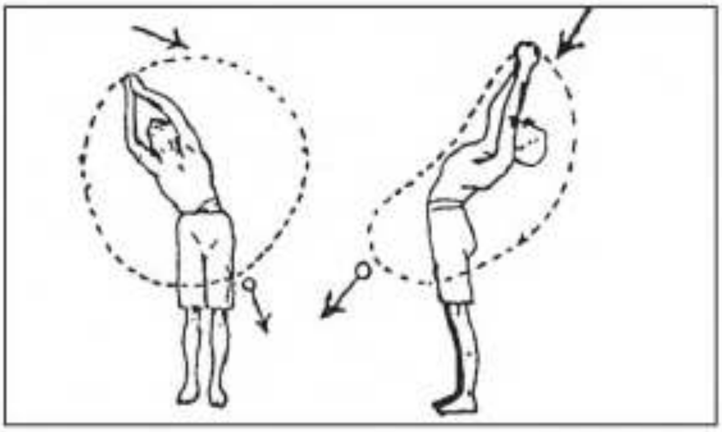

**৫নং পিটি ঃ**

এই পিটি দেহের নিম্নভাগ এবং পায়ের পিছনের অংশের জন্য । পাকস্থলী ও উরুদেশের পেছনে দিকের জন্য এই ব্যায়াম। এ সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বেশি করে নেওয়ার ফলে কলিজা, ফুসফুস ও বুক বিস্তৃত হয় এবং রক্ত সতেজ হয়। খালি পায়ে সোজা মাটিতে দাঁড়িয়ে শরীর যথাসম্ভব আকাশের দিকে উঁচু কর। তারপর আস্তে আস্তে সামনে দিয়ে নিচের দিকে শরীর বাঁকাও এবং হাতের আঙ্গুল দিয়ে পায়ের পাতা ছুঁতে চেষ্টা কর যেন তোমার হাঁটু না ভেঙ্গে সোজা থাকে।

পা দু'টো খানিকটা ফাঁক করে সোজা দাঁড়াও। দু'হাতে মাথার দু'পাশ ছুঁয়ে শরীরকে যথাসম্ভব পিছনে বাঁকিয়ে আকাশের দিকে তাকাও। হাঁটু ও হাত মজবুত রেখে আগের

মত দাঁড়াও। আবার পায়ের পাতা স্পর্শ কর। এভাবে অন্তত ১২ বার অভ্যাস কর।

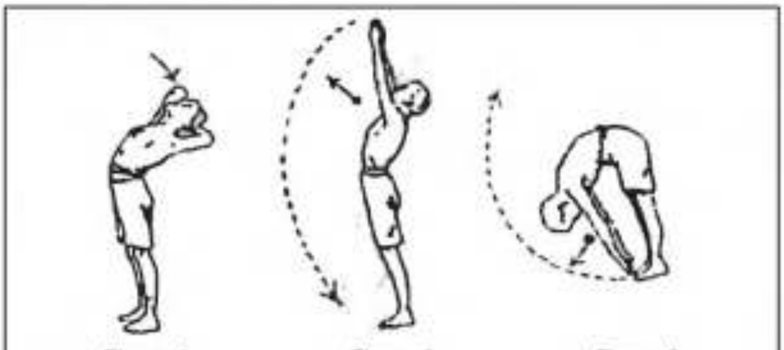

Figure. 1 Figure. 2 Figure. 3

৬নং পিটি ঃ

এই পিটি পায়ের অগ্রভাগের জন্য। পায়ের পাতা সামনে খানিকটা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। দু'হাত কোমরে রেখে পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর করে দাঁড়াও। আস্তে আস্তে হাঁটু দু'দিকে বের করে দিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসতে থাক যতক্ষণ না তুমি কাল্পনিক চেয়ারে বসতে পার, কিন্তু গোড়ালি মাটিতে ঠেকাবে না, উঁচু থাকবে। পিঠের নিচের দিকে ভিতর দিকে বাঁকিয়ে রাখবে। উপরে ওঠার সময় নাক দিয়ে দম নেবে এবং বসার সময়ে কতবার এভাবে বসেছ তার সংখ্যা গুণে মুখ দিয়ে দম ছাড়বে। দেহের সমস্ত ওজন পায়ের আঙ্গুলের ওপর থাকবে। তাই ভারসাম্যরক্ষী হাঁটু দু'দিকে বের করে রাখা দরকার।

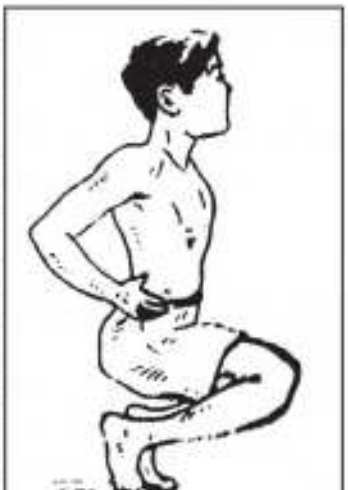

নিয়মিতভাবে হাঁটা, দৌড়ানো এবং ব্যায়ামের অভ্যাস রাখলে শরীর সুস্থ থাকবে। আর মন সুস্থ রাখার জন্য শরীর সুস্থ রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই মন ও শরীরের সুস্থতায় স্কাউটদের উপরোল্লিখিত নিয়ম মেনে চলা বিশেষ কর্তব্য।

# জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা

## ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা

**(ক) শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য নিচের উপদেশ মেনে চলবে**

১. রাতে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়বে এবং খুব ভোরে জেগে ওঠবে।
২. সকালে বা বিকালে খোলা ময়দানে হাঁটাহাঁটি করবে।
৩. নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়াম করবে।
৪. যে কোন পরিশ্রমের কাজ শেষে ঘামে ভেজা কাপড় চোপড় বদলিয়ে ফেলবে এবং শুকনো কাপড় দিয়ে গা মুছে ফেলবে ।
৫. খাবার ভাল করে চিবিয়ে খাবে।
৬. যে সময়ে যে ফল পাওয়া যাবে তা মাঝে মাঝে খাবে।
৭. প্রচুর পানি খাবে। সব সময় পানি ফুটিয়ে খাবে। যেখানে পানি ফুটিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে নলকূপের পানি খেতে চেষ্টা করবে।
৮. নিয়মিত প্রস্রাব, পায়খানা ও গোসল করবে।
৯. সব সময় পরিষ্কার থাকবে।
১০. খোলামেলা বা বাইরের খাবার পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। বাসি বা পচা খাবার খাবে না।
১১. সুষম খাদ্য খাবার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে শাকসব্জি ও সহজলভ্য ফলমূল খেতে চেষ্টা করবে।

নিজের কাপড় চোপড়, বিছানা পত্র, ঘর দরজা, শরীর ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চুল, নখ, দাঁত ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার রাখবে। তাছাড়া তুমি যে মহল্লা বা গ্রামে থাক সেখানকার লোকজনকে পরিষ্কার থাকার উপকারিতা বোঝাতে চেষ্টা করবে। সেখানকার পুকুর, নালানর্দমা, ডোবা, পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে তাদের উৎসাহিত করবে। তুমি নিজে এসব কাজে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে তোমার মর্যাদা বাড়বে, তারাও এসব কাজে যথেষ্ট উৎসাহ পাবে।

**গোসল ঃ**

রোজ গোসল করা ভাল। গোসলের সময় ভাল করে শরীর ঘষে গোসল করবে। এতে ময়লা দূর হয়ে যাবে। রক্ত চলাচল বেড়ে শরীর সজীব হবে। সঙ্গে সঙ্গে গা মুছে ফেলবে এবং শুকনো কাপড় পরবে।

**(খ) লবনে আয়োডিন পরীক্ষা ঃ**

১. খুব সহজেই আমরা বাসায় বসেই লবনে আয়োডিন পরীক্ষা করতে পারি।

(ক) এক চিমটে লবনের মধ্যে তিন থেকে পাঁচ ফোটা লেবুর রস দিলে সাথে সাথে দেখা যাবে লবনের রং বেগুনী হবে। এতে বুঝা যায় লবনে আয়োডিন রয়েছে। কারণ লেবুতে এক প্রকার এসিড রয়েছে।

(খ) এক চিমটে লবনের মধ্যে তিন থেকে পাঁচ ফোটা ভাতের মাড় দিলে সাথে সাথে দেখা যাবে লবনের রং নীল হবে। এতে বুঝা যায় লবনে আয়োডিন রয়েছে। কারণ ভাতের মাড়ে এক প্রকার স্টার্চ উপাদান রয়েছে।

(গ) এছাড়াও এক প্রকার তরল পদার্থ দ্বারা লবনের আয়োডিন পরীক্ষা করা যায়। যার নাম "ক্ষার" দেখতে চোখের ড্রপের মত ছোট পাত্রে থাকে। যা ফার্মেসীতে পাওয়া যেতে পারে।

**পর্যবেক্ষণ ঃ**

আমরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে আমাদের চারপাশকে আরো বেশী করে জানতে পারি। বিপি বলেছেন, "The man who is blind to the beauties of nature has missed half the of life." অর্থাৎ যে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে পায় না সে যেন জীবনের অর্ধেক আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হল। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং নিজেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা যাবে। আমাদের প্রকৃতির কিছু উপাদান হচ্ছে:

**৬ প্রকার ফলজ গাছ** ঃ আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আপেল, কুল ইত্যাদি।
**৬ প্রকার ঔষধী গাছ** ঃ নিম, অর্জুন, তুলসী, কালোমী, হরতকি, বহেরা ইত্যাদি।
**৩ প্রকারের শস্য** ঃ গম, ভূট্টা, ধান ইত্যাদি।
**৩ প্রকারের দানা শস্য** ঃ সরিষা, মটর সুটি, খেসারী ডাল, মুসরির ডাল, ছোলা ইত্যাদি।
**৮ প্রকারের শাক সব্জি** ঃ লাল শাক, মুলা শাক, ডাটা শাক, লাউ শাক ,পুই শাক, পালং শাক, পাট শাক, কলমী শাক ইত্যাদি।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা এসব সম্পর্কে বিশদ জানব এবং এসব সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে শিখব।

## (খ) কিমস গেম

রুডিয়ার্ড কিপলিং এর একটি অনবদ্য চরিত্র কিমবল ওহারা। কিমবল ওহারা ছিল আইরিশ নৌ বাহিনীর এক সার্জেন্টের পুত্র। ছোট বেলা থেকেই কিম অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিল। তার এ ক্ষমতা ও ভারতীয়দের আচার আচরণ ও রীতিনীতি সম্পর্কে কিমের গভীর জ্ঞানের কথা জেনে কর্তৃপক্ষ কিমকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ দেয়। পর্যবেক্ষণ করার জন্য কিমের শিক্ষক লর্গান ট্রেতে বিভিন্ন জহরত রেখে তা এক মিনিট দেখতে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিত। প্রথম প্রথম অল্প কিছু জহরতের নাম বলতে পারলেও কিছুদিনের অভ্যাসের পর ঠিক ঠিক সবক'টি নামের বিবরণ নির্ভুলভাবে দিতে পারল। নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলন করলে যে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব, কিমের গল্পটি তারই প্রমাণ। কিমের নাম অনুসারে এই খেলাটির নাম হয় "কিমস গেম" যা চোখের শক্তি ও মনে রাখার ক্ষমতা প্রখর করে তোলার একটি মজার খেলা।

এবার তোমরা ৩৬টি চেনা জিনিস দিয়ে এই খেলা খেলতে পার। তোমরা যদি ৩৬টি জিনিস এক মিনিট পর্যবেক্ষণ দেখে নির্ভুল ভাবে ২৪টি জিনিসের সঠিক নাম লিখতে বা বলতে পার তাহলে তোমরা এই খেলায় বিজয়ী হবে। পর্যবেক্ষণ কাজে কিমস গেমের ২৪টি জিনিসের নাম লেখা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি চোখের কাজ। এছাড়াও কোন শব্দ শুনে তার বিবরণ দেওয়া, না দেখে কোন জিনিস ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ করে তার নাম বলা। জিহ্বা দিয়ে কোন জিনিসের স্বাদ নিয়ে তার বর্ণনা দেওয়া এবং নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে ইন্দ্রীয়ের ক্ষমতা বাড়াতে পার।

## স্কাউট সেবা

**স্কাউটরা সেবা প্রদানে সদা প্রফুল্ল**

**সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ**

| পার্থক্যের বিষয় | সমাজ সেবা | সমাজ উন্নয়ন |
|---|---|---|
| সংজ্ঞা ঃ | সমাজের মানুষের জন্য স্কাউট উদ্যোগী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করে তাকে সমাজ সেবা বলে। | সমাজের বা এলাকাবাসীর কোন সমস্যা বা সম্ভাবনা বা সমাধান চিহ্নিত করে তা সমাধানে স্কাউটদের নেতৃত্বে বা উদ্যোগে এলাকাবাসী এবং স্কাউটদের যৌথ অংশগ্রহনের মাধ্যমে চিহ্নিত ঐ নির্দিষ্ট সমস্যা বা সম্ভবনা সমাধানকে সমাজ উন্নয়ন বলে। |
| জনশক্তি | সমাজ সেবা একজন দ্বারা করা যায়। | সমাজ উন্নয়নে অধিক লোক সংখ্যা অথবা উপদল ভিত্তিক জনশক্তির প্রয়োজন। |
| সহযোগিতা | সমাজ সেবা কাজে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। | সমাজ উন্নয়নে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে। |
| অর্থ | এ কাজে অর্থের প্রয়োজন হতেও পারে নাও হতে পারে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নিজেই এর ব্যবস্থা করতে পারবে। | এ কাজে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। স্কাউটরা ও এলাকাবাসী অথবা অন্য কোন উৎস হতে অর্থের সংস্থান করতে পারে। |
| সিদ্ধান্ত | এ কাজ করার জন্য নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। | এ কাজ করার জন্য স্কাউটরা এবং এলাকাবাসী/মুরুব্বিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। |
| ফলাফল | এ কাজের ফলাফল স্বল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে। | এ কাজের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। |

(খ) পাড়া-প্রতিবেশীর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা ঃ যেমন-

* চিঠি পোস্ট করে দেয়া।
* দোকান হতে কোন জিনিস এনে দেয়া।
* বাজার করে দেয়া।
* কোন প্রতিবেশীর অনুষ্ঠানে সহায়তা করা।
* প্রতিবেশীর ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল ও মোবাইল ফোনে টাকা লোড/রিচার্জ করে দেয়া।
* ঔষধ এনে দেয়া।
* অসুস্থ হলে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতে সাহায্য করা ইত্যাদি।

(গ) স্কাউট ডেন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যত্ন

স্কাউট ডেন হচ্ছে স্কাউটদের ঠিকানা এবং সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু, তাই স্কাউট ডেনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে রাখা সকলের কর্তব্য। স্কাউট ডেনে সাধারণত প্রত্যেকটি উপদলের একটি পেট্রল কর্ণার থাকে যেখানে সংশ্লিষ্ট উপদলের নিজস্ব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হয়। পাশাপাশি উপদলের মিটিং ও অন্যান্য কার্যক্রম এখান থেকে পরিচালিত হয়। তোমরা তোমাদের স্কাউট ডেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পরিস্কার করবে এবং যে কোন কার্যক্রমের শেষে গুছিয়ে রাখবে।

## প্রাথমিক প্রতিবিধান ঃ

**খাবার স্যালাইনের প্রয়োজনীয়তা ঃ** ডায়রিয়া বা যে কোন ধরনের পাতলা পায়খানাজনিত পানিস্বল্পতা পূরণের জন্য একমাত্র কার্যকর প্রতিকার হলো খাবার স্যালাইন। যখন কেউ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়, তখন তার দেহে পানিশূন্যতা দেখা দেয়, খাবার স্যালাইন দেহের পানিশূন্যতা পূরণে সহায়তা করে। যদি ডায়রিয়া আক্রান্ত লোককে ঠিক সময়মতো খাবার স্যালাইন না দেয়া হয়, সে এমনকি মারাও যেতে পারে। গরম কালে বা কঠোর পরিশ্রম করলে আমাদের শরীর হতে অনেক ঘাম বের হয়, একই সাথে শরীর দূর্বল অনুভব হয়। খাবার স্যালাইন খাওয়ার পর দূর্বলতা অনেকটাই কেটে যায় এবং নিজেকে স্বাভাবিক অনুভব হয়।

**স্যালাইন তৈরিঃ**

১. বর্তমানে তৈরিকৃত অনেক খাবার স্যালাইন আমরা দেখতে পাই। যা তৈরি করা হয় নানা উপাদান দ্বারা। তৈরিকৃত খাবার স্যালাইনে যে সমস্ত উপাদান থাকে তা নিম্নরূপঃ

| | | |
|---|---|---|
| ❑ সোডিয়াম ক্লোরাইড | বি. পি. | ১.৩০ গ্রাম |
| ❑ পটাসিয়াম ক্লোরাইড | বি. পি. | ০.৭৫ গ্রাম |
| ❑ ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, ডাইহাইড্রেট | বি. পি. | ১.৪৫ গ্রাম |
| ❑ গ্লুকোজ, এনহাইড্রোস | বি. পি. | ৬.৭৫ গ্রাম |

এ সমস্ত উপাদান আধা লিটার পরিষ্কার পানিতে মিশিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারি।

২. নিজেই বাসায় বসে খাবার স্যালাইন বানানো কঠিন কাজ নয়। আমাদের হাতের এক মুঠো গুড় অথবা চিনি, এক চিমটি লবন এবং আধা লিটার নিরাপদ পানির প্রয়োজন হয়। এসব কিছু একত্রিত করে আমরা খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারি।

**খাবার স্যালাইন-এর প্যাকেট দিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি ঃ-**

একটি পরিষ্কার পাত্রে আধা লিটার বা ২পোয়া পরিমান বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি নিতে হবে। একটি পরিষ্কার চামচের সাহায্যে মিশ্রণ ও পানি ভালোভাবে মিশিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

**সতর্কতা ঃ** গরম পানিতে খাবার স্যালাইন মেশাবে না বা মেশানো পানীয় গরম করবে না। ১২ঘন্টা পর মেশানো পানীয় ফেলে নতুন করে তৈরি করতে হবে।

**(খ) মানবদেহের নাড়ীর স্পন্দন হার (Pulse Rate) নির্ণয়ঃ**

**তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য ঃ** ধামনিক রক্ত চাপের দুটি পর্যায় সিস্টোল ও ডায়াস্টোল। হৃদপিন্ডের সংকোচনকে সিস্টোল ও প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। সিস্টোল অবস্থায় ধমনীর প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে বলে সিস্টোলিক চাপ ও ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে বলে ডায়াস্টোলিক চাপ। সিস্টোল ও ডায়াস্টোলকে একত্রে নাড়ীর স্পন্দন (Pulse Rate) বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার।

Fig: মানুষের হাত (বাম)

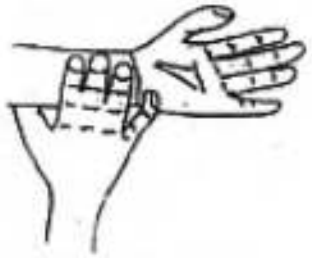

Fig: Pulse Rate নির্ণয় পদ্ধতি

**কার্যপদ্ধতি ঃ** যে ব্যক্তির (Pulse Rate) নির্ণয় করা হবে তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে অথবা টেবিলে চিৎভাবে শুইয়ে দিয়ে তার বাম বা ডান হাতের কবজি কিঞ্চিত উপরের অংশের অঙ্কীয় দিকে রেডিয়াল ধমনী (Redal Artary) -এর অবস্থানের উপর মধ্য তিনটি আঙ্গুল রেখে এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলটি হাতের কব্জির পৃষ্ঠ দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, প্রতি মিনিটে কতবার আঙ্গুল স্পন্দন অনুভূত হয়। এবার ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, প্রতি মিনিটে কতবার আঙ্গুল স্পন্দন অনুভূত হয়। এভাবে তিনটি পাঠ নিয়ে Pulse Rate নির্ণয় করতে হবে।

ব্যক্তির নাম ঃ মাহমুদ
বয়স ঃ ২৩ বৎসর

**সারণি ঃ**

| পর্যবেক্ষণ | সময় (মিনিট) | ফলাফল |
|---|---|---|
| ১ | ১ মিনিট | ৭২ বার |
| ২ | ১ মিনিট | ৭৪ বার |
| ৩ | ১ মিনিট | ৭৩ বার |

**হিসাবঃ**

১ম ১ মিনিট = ৭২ বার
২য় ১ মিনিট = ৭৪ বার
৩য় ১ মিনিট = ৭৩ বার
মোট মিনিট = ২১৯ বার

$$\text{গড়} = \frac{২১৯}{৩} = ৭৩ \text{ বার}$$

**সিদ্ধান্ত ঃ** আমরা জানি, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের নাড়ীর স্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার। উপরের পর্যবেক্ষণ হতে দেখা যায় যে, মাহমুদ-এর নাড়ীর স্পন্দনের হার (Pulse Rate) প্রতি মিনিটে ৭৩ বার। এটি স্বাভাবিক মাত্রা।

**সতর্কমাত্রাঃ**

১. আঙ্গুল এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যে Radial Artary-এর ঠিক উপরে থাকে।
২. পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত সুক্ষভাবে হওয়া উচিত।

## স্লীং ও স্প্লিন্ট এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা

**স্লীং (Sling) ঃ** আহত স্থানকে আরামপ্রদ রাখার জন্য স্লীং ব্যবহার করা হয়। দেহের উর্ধাংগ ভঙ্গের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্লীং ব্যবহার করা হয়। স্লীং কয়েক ধরণের হতে পারে। যেমন-

**(ক) আর্ম স্লীং**

(আর্ম স্লীং বাঁধার দুটি পর্যায়)

অগ্রবাহু আরামে ঝুলিয়ে রাখার জন্য শুধু এই স্লীং ব্যবহার করা হয়।

একটি ভাঁজ ছাড়া ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে তার এক প্রান্ত সুস্থ দিকের কাঁধের উপর রাখতে হবে। ঐ প্রান্তটিই ঘাড়ের পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে আহত দিকের কাঁধের উপর আনতে হবে। অপর প্রান্তটি বুকের সম্মুখ ভাগে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের মাঝখানে আহত হাতটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে শীর্ষ কনুই এর পেছন দিকে থাকে এবং অগ্রবাহু ও বাহুর মধ্যে ৯০ কোণ উৎপন্ন হয়। এবার দ্বিতীয় প্রান্তটি অগ্রবাহুর উপর দিয়ে নিয়ে প্রথম প্রান্তটির সাথে বাঁধতে হবে এবং শীর্ষটি কনুই পর্যন্ত এনে সেফটিপিন দিয়ে ব্যান্ডেজের সামনের দিকে এঁটে দিতে হবে।

### (খ) কলার এন্ড কাফ স্লীং (Collar and Calf Sling)

উর্ধ্ববাহু আহত হলে সাধারণত ঃ এই ধরনের স্লীং ব্যবহার করা হয়। নিম্ন বাহুর নড়াচড়া বা ঝুলিয়ে রাখা আহত উর্ধ্ববাহুর জন্য ক্ষতিকর বলেই এ ধরনের স্লীং এর ব্যবহার আবশ্যক। এই স্লীং ব্যবহার করতে প্রথমে আহত হাতটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে আহত হাতের আঙ্গুলগুলি অপর কাঁধ স্পর্শ করতে পারে। একটি মাঝামাঝি সরু ব্যান্ডেজ নিয়ে তার মাঝামাঝি জায়গায় আহত হাতের কব্জিতে ক্লোভহিচ দিতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি গলার দুই পাশ দিয়ে নিয়ে আহত বাহুর দিকে বেঁধে দিতে হবে।

(গ) ত্রিকোণী স্লীং
**(Triangular Sling)**

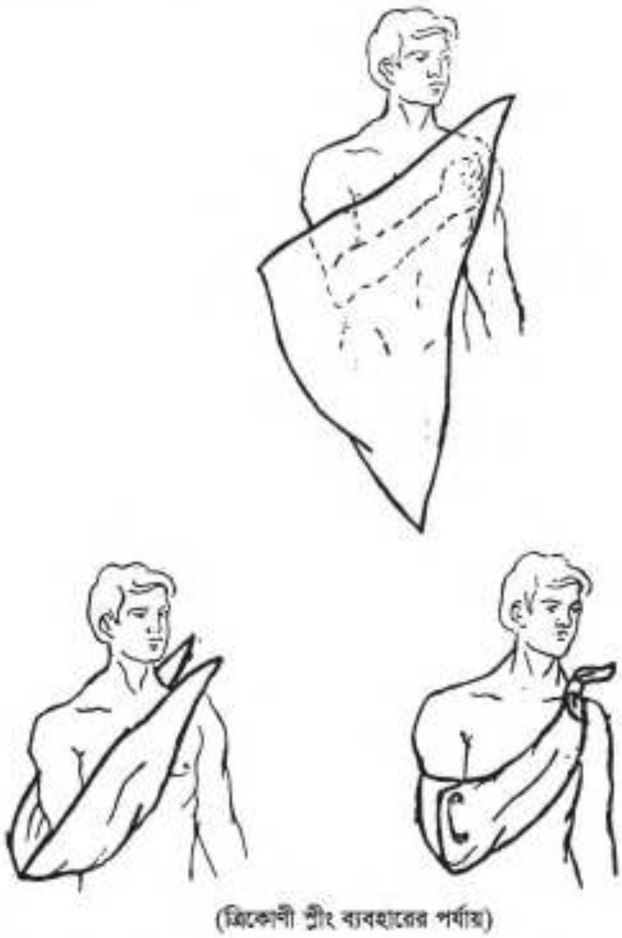

(ত্রিকোণী স্লীং ব্যবহারের পর্যায়)

আহত দিকের হাতটি এমনভাবে বুকের উপর রাখতে হবে যাতে আঙ্গুলগুলি অপর পার্শ্বের কণ্ঠাস্থি স্পর্শ করে এবং তালু বুকের উপর মেলানো অবস্থায় থাকে। এবার একটি ভাঁজবিহীন ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে এমনভাবে বুকের উপর স্থাপন করতে হবে যাতে শীর্ষে আহত ভাঁজ করা হাতের কনুই বরাবর একটু বাইরের দিকে থাকে, এক প্রান্ত বুকে রাখা হাতের আঙ্গুলের উপরে থাকে এবং অপর প্রান্ত সোজাসুজি সামনের দিকে ঝুলে থাকে।

এবার আহত বাহুর নীচ দিয়ে ঝুলন্ত প্রান্তটি পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে কাঁধের উপর অন্য প্রান্তের সাথে বেঁধে দিতে হবে। তারপর হাত দিয়ে শীর্ষসহ ব্যান্ডেজের বাড়তি অংশ ব্যান্ডেজ ও বাহুর মধ্যবর্তী কাঁধে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে প্রবেশ করাতে হবে। এতে যে ভাঁজটির সৃষ্টি হবে তা একটু টেনে বাহু সংলগ্ন ব্যান্ডেজের সাথে সেফটিফিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে।

**(ঘ) ইম্প্রোভাইজড বা বিকল্প স্লীংঃ** উল্লেখিত স্লীংগুলি ছাড়াও প্রয়োজনে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে স্লীং তৈরি করে যদি কাজ মিটানো যায় তবে সেই স্লীংকে ইম্প্রোভাইজড বা বিকল্প স্লীং বলা হয়।

**স্প্লিন্ট ঃ** অস্থি ভঙ্গ হলে স্প্লিন্ট বা চটি ব্যবহার করা হয়। ভগ্নাস্থির আকৃতির উপর ভিত্তি করে স্প্লিন্ট এর সাইজ নির্ণয় করতে হয়। পাতলা কাঠ হার্ডবোর্ড বা বাঁশের চটা দিয়ে স্প্লিন্ট তৈরি করা যায়।

## তথ্যানুসন্ধান

স্কাউট সদা প্রস্তুত। কোন বিপদ আপদে নিকটবর্তী হাসপাতালের সেফ ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা থাকতে হবে। নিজ নিজ এলাকার জরুরী নাম্বারগুলো ইউনিট লিডার থেকে জেনে নিয়ে তা মুখস্থ অথবা এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন জরুরী প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ কাছে পাওয়া যায় এবং যোগাযোগ করা যায়। ঢাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের কিছু তথ্য নিম্নে দেওয়া হলোঃ

### হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স ও ব্লাড ব্যাংক

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
৮৬২৬৮১২-৯

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬১২৫৫-০৪, ৮৬১৮৬৫২-৯, ৯৬৬১০৫১-৬৫

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল ৭৩১৯০০২-৬, ৭৩১৯৯৩৫, ৭৩১০০৬১-৬৪

ঢাকা শিশু হাসপাতাল
৯১১৯১১৯, ৮১১৬০৬১-২

জাতীয় চক্ষুরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
৮১১৪৮০৭

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
৯১২২৫৬০-৭২

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট হাসপাতাল ৯১১৮১৭১

বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
৮৮১৬২৬৮-৭২, ৯৮৯৯৪২২-৩

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৯১৩০৮০০, ৯১২২৫৬০-৭৮

জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
৯১২৩৭২২

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৯৮৮০২৬৯

বারডেম হাসপাতাল ৯৬৬১৫৫১-৬০, ৮৬১৬৬৪১-৫০

ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ৯৬৭১১৪১-৩, ৯৬৭১১৪৫-৭

ঢাকান্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ৭১১৩৪৬৯, ৭১১৭৩০০

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ওপুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান ৯১১৪০৭৫, ৮৮৬০৫২৩-৩২

ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল ৯১১৯৩১৫, ৮১১২৮৫৬

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৮০৯৩৯৩৫,৮০৫৩৯৩৬, ৮০৬১৩১৪-৬

সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ৮১১৪৬৬৬-৭৫, ৮৮২২৭৭৯, ৯৮৭০০১১

হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ৮৩১১৭২১-৫

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল ৮৬১৭২০৮, ৯৬৭৩৫১২, ৯৬৭৩৫০৭, ৮৬১৭৩৮৩

ব্লাড ব্যাংক সন্ধানী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখা ৯৬৬৮৬৯০, ৮৬১৬৭৪৪

রেড ক্রিসেন্ট ব্লাড ব্যাংক ৯১১৬৫৬৩, ৮১২১৪৯৭

**অ্যাম্বুলেন্স সেবা**

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ৯৩৩৬৬১১

আল-মারকাজুল ইসলামী অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ৯১২৭৮৬৭, ৮১১৪৯৮০

আদ্ -দ্বীন হাসপাতাল ৯৩৬২৯২৯, ০১৭১৩৪৮৮৪১১-৫

## সঞ্চয়/উপার্জন করা

প্রত্যেকটি তরুণ তরুণী চায় স্বাবলম্বী হতে। এতে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। নিজের শখের জিনিসগুলো যদি নিজের রোজগার করা টাকায় জোগাড় করা যায় তবে তার চেয়ে খুশির ব্যাপার আর কি? তাই প্রত্যেক স্কাউটের উচিত অর্থ উপার্জন করা। কিন্তু টাকা রোজগার করাটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। যেমন একটা ছেলে তার মায়ের কাছে কিছু পয়সা চাইল। আর মা তাকে পয়সা দিয়ে দিলেন। ছেলে কিছু পয়সা পেল। কিন্তু ঐ পয়সাগুলো ছেলে সঠিক অর্থে রোজগার করেনি। এটা ছেলের জন্য মায়ের দান মাত্র। এতে বোঝা যায়, চেয়ে নেওয়া টাকা মোটেই রোজগার নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্কাউটেরা যেন টাকা রোজগার করে। কাজ করে টাকা পয়সা জোগাড় করবে। খুব সহজেই পরিশ্রমের বদলে টাকা রোজগার করা যেতে পারে।

যদি তুমি গ্রামের স্কাউট হও তবে কারো জমিতে শ্রমের কাজ করে দিলে তিনি তোমাকে মজুরি দেবেন তা তোমার রোজগার করা হবে। তাছাড়াও নিজ বাসায় হাঁস, মুরগি, কবুতর পুষে এবং তা বিক্রি করে রোজগার করা যায়। বর্ষাকালে পাটখড়ি (যা লোকে ফেলে দিয়েছে) জোগাড় করে শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করলে টাকা পাবে। যদি শহরের স্কাউট হও তোমার বাসার পুরানো অপ্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন জুতা, সেন্ডেল, কাপড়, খাতাপত্র জমিয়ে রাখ। পরে বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করলে যে টাকা হবে তা তোমার রোজগার করা আয়। তবে শহরেও আজকাল প্রাণী পুষে তা থেকে আয় করা যায়। তোমার স্কুলে ব্যবহৃত রাফ খাতা লেখা হয়ে গেলে তা ওজন দরে বিক্রি না করে ওই কাগজ দিয়ে যদি তুমি ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি কর তাহলে কাগজ বেচার চেয়ে বেশি দাম হবে। বাড়িতে রাখা খবরের কাগজ দিয়েও ঠোঙা বানিয়ে তা বিক্রি করে তুমি কিছু আয় করতে পার। এভাবে কমপক্ষে দশ টাকা আয় কর। একাজে তোমার অভিভাবকদের পরামর্শ নেবে। তুমি কিভাবে টাকা রোজগার করলে তার বিবরণ তোমার স্কাউট লিডারকে জানাও। নিজের শ্রম দিয়ে টাকা রোজগার করলে সুখ পাওয়া যায়। তার চেয়েও বেশি সুখ পাওয়া যায় সে টাকা ভাল কাজে খরচ করে।

## স্বদেশ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ

(১) নিজ এলাকার অবস্থার সম্পর্কে তথ্য নিজ ইউনিট লিডার/ গ্রুপ লিডার এর নিকট হতে জানতে হবে।

**(২) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঃ**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় উপাধি বীরশ্রেষ্ঠ। ১৯৭৩ সালে ১৯ ডিসেম্বর সরকারি গেজেট নোটিফেকেশন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাতজন বীর সন্তানকে মরনোত্তর উপাধি দেওয়া হয়। অনেক বাঁধা, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। যাদের হারিয়ে আজ আমরা 'স্বাধীন' তাদের মধ্যে সাত বীরশ্রেষ্ঠের কথা এখানে আলোচনা করা হল-

# বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন

বিমান হতে বোমা বর্ষণ, স্থলে জলে
ধ্বংশ করতে আমাদেরকে,
শুরু হোক নতুন সংগ্রাম
বিজয় আমাদেরই হবে।

**এক নজরে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন**

পিতা- আজাহার পাটোয়ারী, মাতা- জোলেখা খাতুন, জন্ম- ১৯৩৫ সালের ১০ ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলার বাঘচাপাড়া গ্রামে।

নৌ-বাহিনীতে ভর্তি- ১৯৫৩ সালে জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধক্ষেত্র - রূপসা, খুলনা, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। সেক্টর কমান্ডার- মেজর খালেদ মোশাররফ। সমাধি- রূপসা ফেরিঘাটের পূর্বপাড়ে, খুলনা।

**বীরত্বের বিবরণ ঃ** ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ঘাটি থেকে পালিয়ে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে ২ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। মেজর শফিউল্লাহ্ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে নৌবাহিনীর সদস্যদের যাঁরা  বিভিন্ন সেক্টর ও সাব- সেক্টর থেকে মুক্তিযুদ্ধ করছিলেন তাঁদেরকে সেপ্টেম্বর মাসে একত্রিত করা হয় আগরতলায় এবং গঠন করা হয় ১০নং সেক্টর। ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন নৌবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে আগরতলায় একত্রিত হয়ে কলকাতায় আসেন এবং যোগ দেন ১০ নং সেক্টরে। ভারত সরকার বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে দুটি গানবোট উপহার দেয়। গানবোটের নামকরণ করা হয় 'পদ্ম' ও 'পলাশ'। রুহুল আমিন পলাশের প্রধান ইঞ্জিনরুমে আর্টিফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী যশোর সেনানিবাস দখলের পর 'পদ্ম' 'পলাশ' এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর একটি গানবোট 'পানভেল' খুলনার মংলা বন্দরে পাকিস্তানি নৌ-ঘাটি পি.এন.এস. তিতুমীর দখলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-এ প্রবেশ করে। ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টার দিকে গানবোটগুলো  খুলনা শিপইয়ার্ডের  কাছে এলে  অনেক উঁচুতে তিনটি জঙ্গি

বিমানকে উড়তে দেখা যায়। শত্রুর বিমান অনুমান করে পদ্মা ও পলাশ থেকে গুলি করার অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযানের সর্বাধিনায়ক ক্যাপ্টেন মনেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিমান মনে করে গুলিবর্ষণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এর কিছুক্ষণ পরে বিমানগুলো অপ্রত্যাশিত ভাবে নিচে নেমে আসে এবং আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে। গোলা সরাসরি 'পদ্মা' এর ইঞ্জিন রুমে আঘাত করে ইঞ্জিন বিধ্বস্ত করে। হতাহত হয় অনেক নাবিক। 'পদ্মা'র পরিণতিতে পলাশের অধিনায়ক লে. কমান্ডার রায় চৌধুরী নাবিকদের জাহাজ ত্যাগের নির্দেশ দেন। রুহুল আমিন এই আদেশে ক্ষিপ্ত হন। তিনি উপস্থিত সবাইকে যুদ্ধ বন্ধ না করার আহ্বান করেন। কামানের ক্রুদের বিমানের দিকে গুলি ছুঁড়তে বলে ইঞ্জিন রুমে ফিরে আসেন। কিন্তু অধিনায়কের আদেশ অমান্য করে বিমানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

বিমানগুলো উপর্যুপরি বোমাবর্ষণ করে পলাশের ইঞ্জিনরুম ধ্বংস করে দেয়। আহত হন তিনি। কিন্তু অসীম সাহসী রুহুল আমিন তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যান পলাশকে বাঁচানোর। অবশেষে পলাশের ধ্বংসাবশেষ পিছে ফেলেই আহত রুহুল আমিন ঝাঁপিয়ে পড়েন রূপসা-এ। প্রাণশক্তি-তে ভরপুর এ যোদ্ধা একসময় পাড়েও এসে পৌছান। কিন্তু ততক্ষণে সেখানে ঘৃণ্য রাজাকারের দল অপেক্ষা করছিল তার জন্য। আহত এই বীর সন্তানকে তারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে রূপসার পাড়েই।

# বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

"মাগো ভাবনা কেন
আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্রহাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি... ।"

**এক নজরে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ**

পিতা- মোহাম্মদ আমানত শেখ, মাতা- জেন্নাতুন্নেসা, জন্ম- ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। বাংলাদেশ রাইফেলসে ভর্তি (বর্তমানে বডার গার্ড বাংলাদেশ) - ১৪ মার্চ, ১৯৫৯। যুদ্ধক্ষেত্র- সুতিপুর, যশোর, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল। সেক্টর কমান্ডার- মেজর এম. এ. মঞ্জুর। সমাধি- কাশিপুর, যশোর।

**বীরত্বের বিবরণ ঃ** ১৯৭০ সালে নূর মোহাম্মদকে দিনাজপুর থেকে যশোর বদলি করা হয়। বদলি স্থানে যোগদানের আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন। ১৯৭১-এর ৫ সেপ্টেম্বর সুতিপুরে নিজস্ব প্রতিরক্ষার সামনে গোয়ালহাটি গ্রামে নূর মোহাম্মদকে অধিনায়ক করে পাঁচজনের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্ট্যান্ডিং পেট্রোল পাঠানো হয়। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পেট্রোলটি তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পেছনে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা থেকে পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হয়। তবু পেট্রোলটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। এক সময়ে সিপাহী নান্নু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নূর মোহাম্মদ নান্নু মিয়াকে কাঁধে তুলে নেন এবং হাতের এল.এম.জি দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করলে শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপসরণ করতে বাধ্য হয়। হঠাৎ করেই শত্রুর মর্টারের একটি গোলা এসে লাগে তাঁর ডান কাঁধে।

ধরাশয়ী হওয়া মাত্র আহত নান্নু মিয়াকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। হাতের এল.এম.জি সিপাহী মোস্তফাকে দিয়ে নান্নু মিয়াকে নিয়ে যেতে বললেন এবং মোস্তফার রাইফেল চেয়ে নিলেন। যতক্ষণ না তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন ততক্ষণে ঐ রাইফেল দিয়ে শত্রুসৈন্য ঠেকিয়ে রাখবেন এবং শত্রুর মনোযোগ তাঁর দিকেই কেন্দ্রীভূত করে রাখবেন। অন্য সঙ্গীরা অনুরোধ করলেন তাদের সাথে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে গেলে সবাই মারা পড়বে এই আশঙ্কায় তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। বাকিদের অধিনায়োকোচিত আদেশ দিলেন তাঁকে রেখে চলে যেতে। তাঁকে রেখে সন্তর্পণে সরে যেতে পারলেন বাকিরা। এদিকে সমানে গুলি ছুড়তে লাগলেন রক্তাক্ত নূর মোহাম্মদ। একদিকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী, সঙ্গে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, অন্যদিকে অর্ধমৃত নূর মোহাম্মদ সম্বল একটি মাত্র রাইফেল ও সীমিত গুলি। এই অসম অবিশ্বাস্য যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের এমন ক্ষতিসাধন করেন যে তারা এই মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। পরে প্রতিরক্ষার সৈনিকরা এসে পাশের একটি ঝাড় থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

# বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ

"এক নদী রক্ত পেরিয়ে
বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনল যারা
তোমাদের এই ঋণ কোনদিন শোধ হবে না.. ।"

**এক নজরে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ**

পিতা- মুন্সী মেহেদী হোসেন, মাতা-মকিদুন নেসা, জন্ম- ১৯৪৩ সালের ৮ এপ্রিল ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার সালামতপুর গ্রামে। তিনি রাইফেলস-এ ভর্তি হন ১৯৬৩ সালে ৮ মে মাসে। যুদ্ধক্ষেত্র- বুড়িঘাট, রাঙামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ২০ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। সেক্টর কমান্ডার- মেজর জিয়াউর রহমান। সমাধি- রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচরের বুড়িঘাটে।

**বীরত্বের বিবরণ ঃ** ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পনীর সাথে বুড়িঘাটে অবস্থান নেন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি জলপথ প্রতিরোধ করার জন্য ৮ এপ্রিল পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের দুই কোম্পানী সৈন্য, সাতটি স্পীড বোট এবং দুটি লঞ্চে করে বুড়িঘাট দখলের জন্য অগ্রসর হয়। তারা প্রতিরক্ষা বূহ্যের সামনে এসে ৩" মর্টার এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র দিয়ে হঠাৎ অবিরাম গোলা বর্ষন শুরু করে। গোলাবৃষ্টির তীব্রতায় প্রতিরক্ষার সৈন্যরা পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ল্যান্সনায়েক মুন্সি আব্দুল রউফ পেছনে হটতে অস্বীকৃতি জানান। নিজ পরিখা থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু করেন। মেশিনগানের এই পাল্টা আক্রমণের ফলে শত্রুদের স্পীড বোট গুলো ডুবে যায়। হতাহত হয় এর আরোহীরা। পেছনের দুটো লঞ্চ দ্রুত পেছনে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শুরু করে দুরপাল্লার ভারী গোলাবর্ষণ। মর্টারের ভারী গোলা এসে পরে আব্দুল রউফের উপর। লুটিয়ে পড়েন তিনি, নীরব হয়ে যায় তাঁর মেশিনগান। ততক্ষণে নিরাপদ দূরুত্বে সরে যেতে সক্ষম হন তাঁর সহযোদ্ধারা।

# বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল

"সব কটা জানালা খুলে দাও না
আমি গাইব গাইব বিজয়েরই গান... ।"

**এক নজরে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল**

পিতা- হাবিবুর রহমান, মাতা- মালেকা বেগম, জন্ম- ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজীপুর গ্রামে। সেনাবাহিনীতে ভর্তি- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৭। যুদ্ধক্ষেত্র- দরুইন, গঙ্গাসাগর, আখাউড়া, ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। সেক্টর কমান্ডার- মেজর খালেদ মোশাররফ।

সমাধি- দরুইন। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল আখাউড়ার দরুইন গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত।

**বীরত্বের বিবরণ ঃ** ১৬ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুমিল্লা-আখাউড়া রেললাইন ধরে উত্তর দিকে এগুতে থাকে। ১৭ এপ্রিল পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনী দরুইন গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর মর্টার ও আর্টিলারীর গোলাবর্ষণ শুরু করলে মেজর শাফায়াত জামিল ১১ নম্বর প্লাটুনকে দরুইন গ্রামে আগের প্লাটুনের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে হাবিলদার মুনির দরুইনে পৌঁছেন। সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল তার নিকট থেকে গুলি নিয়ে নিজ পরিখায় অবস্থান গ্রহণ করেন। বেলা ১১ টার দিকে শুরু হয় শত্রুর গোলাবর্ষণ। সেই সময়ে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। সাড়ে ১১ টার দিকে মোগরা বাজার ও গঙ্গা সাগরের শত্রু অবস্থান থেকে গুলি বর্ষিত হয়। ১২ টার দিকে আসে পশ্চিম দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ। প্রতিরক্ষার সৈন্যরা আক্রমণের তীব্রতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। কয়েক জন শহীদ হন। মোস্তাফা কামাল মরিয়া হয়ে পাল্টা গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর পূর্ব দিকের সৈন্যরা পেছনে সরে নতুন অবস্থানে সরে যেতে থাকে এবং মোস্তাফাকে যাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তাদের সবাইকে নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগের জন্য মোস্তাফা পূর্ণোদ্যমে এল.এম.জি থেকে গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর ৭০ গজের মধ্যে শত্রুপক্ষ চলে এলেও তিনি থামেননি। এতে করে শত্রুরা তাঁর সঙ্গীদের পিছু ধাওয়া করতে সাহস পায়নি। এক সময় গুলি শেষ হয়ে গেলে, শত্রুর আঘাতে তিনিও লুটিয়ে পড়েন।

# বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

"সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির স্মরণে॥"

**এক নজরে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর**

পিতা- আব্দুল মোতালেব হাওলাদার, মাতা- সাফিয়া খাতুন, জন্ম- ১৯৪৯ সালে বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে। বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর। সেনাবাহিনীতে ভর্তি- ৫ অক্টোবর, ১৯৬৭। যুদ্ধক্ষেত্র- বারঘরিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৪ডিসেম্বর, ১৯৭১। সেক্টর কমান্ডার- মেজর নাজমুল হক। সমাধি- ঐতিহাসিক গৌরনগরীর সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণ।

**বীরত্বের বিবরণ ঃ** ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি পাকিস্তানে ১৭৩ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ানে কর্তব্যরত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি ছুটে এসেছিলেন পাকিস্তানের দুর্গম এলাকা অতিক্রম করে। তবে ৩ জুলাই পাকিস্তানে আটকে পড়া আরো তিনজন অফিসারসহ তিনি পালিয়ে যান ও পরে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনীর ৭নং সেক্টরে সাব সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যোগ দেন। তিনি সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হকের অধীনে যুদ্ধ করেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখানোর কারণে তাঁকে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট আউয়াল ও ৫০ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জের পশ্চিমে বারঘরিয়া এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বারঘরিয়া এলাকা থেকে ৩/৪ টি দেশী নৌকায় করে

রেহাইচর এলাকা থেকে মহানন্দা নদী অতিক্রম করেন। নদী অতিক্রম করার পর উত্তর দিক থেকে একটি একটি করে প্রত্যেকটি শত্রু অবস্থানের দখল নিয়ে দক্ষিণে এগোতে থাকেন। তিনি এমনভাবে আক্রমণ পরিকল্পনা করেছিলেন যেন উত্তর দিক থেকে শত্রু নিপাত করার সময় দক্ষিণ দিক থেকে শত্রু কোন কিছু আঁচ করতে না পারে। এভাবে এগুতে থাকার সময় জয় যখন প্রায় সুনিশ্চিত তখন ঘটে বিপর্যয়। হঠাৎ বাঁধের উপর থেকে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের ৮/১০ জন সৈনিক দৌড়ে চর এলাকায় এসে যোগ দেয়। এরপরই শুরু হয় পাকিস্তান বাহিনীর অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জীবনের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যান। ঠিক সেই সময়ে শত্রুর একটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় জাহাঙ্গীরের কপালে। শহীদ হন তিনি। স্বাধীনতার উষালগ্নে বিজয় সুনিশ্চিত করেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ আঙিনায় সমাহিত করা হয়।

# বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলবোনা।

**এক নজরে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান**

পিতা- আব্বাস আলী মণ্ডল, মাতা- মোসাম্মাৎ কায়সুন নেসা, জন্ম- ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন যশোর জেলার (বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা) মহেশপুর উপজেলার খোরদা খালিশপুর গ্রামে। সেনাবাহিনীতে ভর্তি- ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০। যুদ্ধক্ষেত্র- ধলই, শ্রীমঙ্গল, সিলেট (২৮ অক্টোবর, ১৯৭১)।

সেক্টর কমান্ডার- মেজর সি. আর. দত্ত। স্মৃতিসৌধ- ধলই সীমান্ত ফাঁড়ি, মৌলভিবাজার। সমাধি- প্রথম ভারতের ভূখণ্ডের আমবাসা গ্রাম এবং পরবর্তীতে বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, মিরপুর, ঢাকা।

**বীরত্বের বিবরণ :** অক্টোবরের ২৮ তারিখে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পাকিস্তান বাহিনীর ৩০ এ ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর মেশিনগান পোস্টে গ্রেনেড হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রেনেড ছোড়ার দায়িত্ব দেয়া হয় হামিদুর রহমানকে। তিনি পাহাড়ি খালের মধ্য দিয়ে হেঁটে গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। দুটি গ্রেনেড সফলভাবে মেশিনগান পোস্টে আঘাত হানে, কিন্তু তার পরপরই হামিদুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। সে অবস্থাতেই তিনি মেশিনগান পোস্টে গিয়ে সেখানকার দুই জন পাকিস্তানী সৈন্যের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করেন। এভাবে আক্রণের মাধ্যমে হামিদুর রহমান এক সময় মেশিনগান পোস্টকে অকার্যকর করে দিতে সক্ষম হন। এই সুযোগে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল উদ্যমে এগিয়ে যান, এবং শত্রু পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে সীমানা ফাঁড়িটি দখল করতে সমর্থ

হন। কিন্তু হামিদুর রহমান বিজয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেননি, ফাঁড়ি দখলের পরে মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হামিদুর রহমানের লাশ উদ্ধার করেন। হামিদুর রহমানের মৃতদেহ সীমান্তের অল্প দূরে ভারতীয় ভূখন্ডে ত্রিপুরা রাজ্যের হাতিমেরছড়া গ্রামের স্থানীয় এক পরিবারের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। নীচু স্থানে অবস্থিত কবরটি এক সময় পানির তলায় তলিয়ে যায়। ২০০৭ সালের ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার হামিদুর রহমানের দেহ ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাইফেলসের একটি দল ত্রিপুরা সীমান্তে হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

# বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

প্রতিদিন তোমায় দেখি সূর্যরাগে
প্রতিদিন তোমার কথা হৃদয়ে জাগে
ও আমার দেশ ও আমার বাংলাদেশ।

**এক নজরে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান**

পিতা- মৌলভী আব্দুস সামাদ, মাতা- সৈয়দা মোবারুকুন নেসা। জন্ম- ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর পুরান ঢাকার ১০৯ আগা সাদেক রোডের পৈত্রিক বাড়ী "মোবারক লজ"-এ। বিমান বাহিনীতে ভর্তি ঃ ১৯৬১ সালে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধক্ষেত্র- সিন্ধু প্রদেশের থাট্টা অঞ্চলে বিমান বিধ্বস্ত, ২০ আগস্ট, ১৯৭১ সালে। সমাধি- মৌরিপুর, মশরুর বিমান ঘাঁটি, করাচি, বর্তমানে বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, মিরপুর, ঢাকা।

**বীরত্বের বিবরণ ঃ** ১৯৭১ সালের শুরুতে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে মতিউর সপরিবারে দুই মাসের ছুটিতে ঢাকা আসেন। ২৫ মার্চের কাল রাতে মতিউর ছিলেন রায়পুরের রামনগর গ্রামে। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হয়েও অসীম ঝুঁকি ও সাহসিকতার সাথে ভৈরবে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুললেন। যুদ্ধ করতে আসা বাঙালি যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্র দিয়ে গড়ে তুললেন একটি প্রতিরোধ বাহিনী। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি বিমান বাহিনী ' সেভর জেড' বিমান থেকে তাঁদের ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করে। মতিউর রহমান পূর্বেই এটি আশঙ্কা করেছিলেন। তাই ঘাঁটি পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পান তিনি ও তাঁর বাহিনী। এরপর ১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল ঢাকা আসেন ও ৯ মে সপরিবারে করাচি ফিরে যান।

১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট শুক্রবার ফ্লাইট শিডিউল অনুযায়ী তার ছাত্র রশিদ মিনহাজের উড্ডয়নের দিন ছিলো। মতিউর পূর্ব পরিকল্পনা মতো অফিসে এসে শিডিউল টাইমে গাড়ি নিয়ে চলে যান রানওয়ের পূর্ব পাশে। সামনে পিছনে দুই সিটের প্রশিক্ষণ বিমান টি-৩৩। মিনহাজ বিমানের সামনের সিটে বসে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসতেই তাঁকে অজ্ঞান

করে ফেলে বিমানের পেছনের সিটে লাফিয়ে উঠে বসলেন। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে মিনহাজ বলে ফেললেন, তিনিসহ জঙ্গি বিমানটি হাইজ্যাকড হয়েছে। ছোট পাহাড়ের আড়ালে থাকায় কেউ দেখতে না পেলেও কন্ট্রোল টাওয়ার তা শুনতে পেল। বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মতিউর বিমান নিয়ে ছুটে চললেন। রাডারকে ফাঁকি দেবার জন্য নির্ধারিত উচ্চতার চেয়ে অনেক নিচ দিয়ে বিমান চালাচ্ছিলেন তিনি। এসময় অপর চারটি বিমান মতিউরের বিমানকে ধাওয়া করে। এ সময় মিনহাজ জ্ঞান ফিরে পায় ও তার সাথে মতিউরের ধ্বস্তাধস্তি চলতে থাকে। এক পর্যায়ে রশীদ ইজেক্ট সুইচ চাপলে মতিউর বিমান থেকে ছিটকে পড়েন এবং বিমান উড্ডয়নের উচ্চতা কম থাকায় রশীদ সহ বিমানটি ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে থাট্টা এলাকায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। মতিউরের সাথে প্যারাসুট না থাকাতে তিনি নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ ঘটনাস্থল হতে প্রায় আধ মাইল দূরে পাওয়া যায়। রশীদকে পাকিস্তান সরকার সম্মানসূচক খেতাব দান করে। প্রসঙ্গতঃ একই ঘটনায় দুই বিপরীত ভূমিকার জন্য দুইজনকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক খেতাব প্রদানের এমন ঘটনা বিরল। মতিউরকে করাচির মাসরুম বেসের চতুর্থ শ্রেণীর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

২০০৬ সালের ২৩ জুন মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় ২৫ জুন শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

# পরিবেশ

**ক) পরিবেশ দূষন কি এবং এর কারণঃ**

আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। যেমন-প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, প্রাণীকুল, নদ-নদী, মাটি, পানি, ঘর-বাড়ি, বাতাস এই সব কিছুই পরিবেশের অংশ। পরিবেশ দূষন আমাদের জীবনযাত্রা এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক বিপদজনক। যে সমস্ত কারনে প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ হুমকির মুখে একই সাথে যার প্রভাব মানুষের উপর বিস্তার করছে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, তাই পরিবেশ দূষন। পরিবেশ দূষন চারটি মৌলিক উপাদানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যথা ঃ পানি, বাতাস/বায়ু, শব্দ ও মাটি।

**কারণ ঃ** গাছ কাটা, বন উজাড় বা ধ্বংস করা, ময়লা-আর্বজনা নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলা, ইটের ভাটার ধোঁয়া, প্লাষ্টিক টায়ার পোড়ানো, কল-কারখানার বর্জ্য পানিতে ফেলা, যানবাহনের ভেঁপু ও বাঁশির আওয়াজ, উচ্চ আওয়াজে গান শোনা, মাইকে লাউড স্পীকার-এর আওয়াজ, অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মাটিতে অধিক সার প্রয়োগ ইত্যাদি।

**খ) পরিবেশ দূষন রোধ করার পদ্ধতি জানা ঃ**

পরিবেশ দূষন রোধ করার পদ্ধতি আমাদের সবার জানা আছে। একটু সর্তক ও সচেতন হলে আরো সহজেই তা করতে পারি। যেমন ঃ

- গাছ বা বন ধ্বংস না করা।
- নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা-আবর্জনা, থু থু ফেলা।
- ধোঁয়া সৃষ্টি না করা।
- প্লাষ্টিক বা টায়ার পোড়ানো বন্ধ করা।
- কল কারখানার বর্জ্য পানিতে না ফেলা।
- ভেপু বা হর্ন না বাজানো।
- উচ্চ আওয়াজে গান না শোনা।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।
- অযথা সার প্রয়োগ না করা ইত্যাদি।

**গ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযানে অংশগ্রহন করা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা ঃ**
স্কাউট হিসেবে নিজ উপদল বা ইউনিটের সাথে অথবা নিজ উদ্যোগে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযানে অংশগ্রহন করতে হবে এবং এ কাজে অংশগ্রহন করার জন্য অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারন পরিবেশ ভাল না থাকলে আমরাও ভাল থাকব না। আমাদের জন্য আমরা আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব।

**ঘ) পানি দূষন ঃ**
পানির অপর নাম জীবন। অতীতে পৃথিবীতে যত পানি ছিল, বর্তমানে তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। কিন্তু দিনে দিনে নিরাপদ ও ব্যবহার্য পানির পরিমান কমছে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল হলেও মোট পানির তিন শতাংশ মিঠা পানি। এই সীমিত পানিও নিম্নোক্ত কারণে দূষিত হচ্ছে ঃ
-কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদী, পুকুর ও খালকে দূষিত করছে।
- কলকারখানার বর্জ্য ড্রেইনের মাধ্যমে জলাশয়ে ফেলা
- ঘর বাড়ির পয়োবর্জ্য জলশয়ে ফেলা।
– তেলের ট্যাংকার ফুটো হয়ে যাওয়া।
- পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেলা।

**তুমি যা করতে পার-**
- পুকুর বা নদীর পানিতে সরাসরি সাবান ব্যবহার না করা। প্রয়োজন বোধে কোন পাত্রে পুকুর/লেক বা নদী থেকে পানি তুলে এনে তাতে সাবান ব্যবহার করতে পার।
- উন্মুক্ত পানিতে হাড়ি-পাতিল, কাপড়-চোপড় ধোবার কাজে ডিটারজেন্ট না ব্যবহার করে বার সাবান ব্যবহার করা, কারণ সাবান পানিতে দ্রবণীয়। কোন পাত্রে পানি তুলে এনে ব্যবহার করা উত্তম।
- পানিতে কোন রকম ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ না করা।

**পানি বিশুদ্ধ করণের কয়েকটি নিয়ম নিম্নরূপ-**

ক) ফিটকারি দেওয়া।
খ) পানি ১৫ থেকে ২০ মিনিট ফুটানো।
গ) পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দেওয়া ইত্যাদি।

## প্রযুক্তি শেখা

**কম্পাস বা দিক নির্ণয় যন্ত্র ঃ**

**সংজ্ঞা ঃ** যে যন্ত্র দ্বারা আমরা দিক নির্ণয় করি তাকে কম্পাস বলে। কম্পাসের উপরিভাগে কতকটা ঘড়ির কাঁটার মত। এর উপরিভাগে উত্তর, দক্ষিণ, ও পূর্ব, পশ্চিম লেখা এবং ডিগ্রি ভাগ করা থাকে। ঘড়ির কাঁটার মত মোটা ও সূঁচালো চুম্বক দন্ডটি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করে। এর কারণ হচ্ছে পুরো পৃথিবীটা একটি বিশাল চুম্বক, আর এ পৃথিবীর উত্তর দিকটা চুম্বকের একটি দিককে প্রচন্ড ভাবে আকর্ষণ করে। চুম্বক দন্ডের এই প্রান্তটিকে উত্তর দিক ধরে লাল বা কালো রঙে রাঙিয়ে নেয়া হয় অথবা তীরের সূচালো অংশ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

**দুইটি উত্তর ঃ** মানচিত্রের উত্তর ও চৌম্বকের উত্তরের মধ্যে কিছুটা তফাৎ রয়েছে। মানচিত্রের উত্তর নির্দেশ করে সুমেরু (North Pole) কে, যাকে প্রকৃত উত্তর (True North) বলা হয়। অপর দিকে চুম্বক নির্দেশ করে চৌম্বকীয় উত্তরকে (Magnetic North)। চৌম্বকীয় উত্তর আর্কটিক সাগরে কানাডার বার্থষ্ট (Bathurst Island) দ্বীপে অবস্থিত যা (North Pole) সুমেরু হতে ১,৬০০ কি.মি (১০০০ মাইল) দূরে অবস্থিত। মানচিত্রে এ দুটি উত্তরের পার্থক্য প্রায় ১৫$^{\circ}$।

**দিকের বর্ণনা ঃ**

১। প্রধান চারটি (উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব, পশ্চিম) দিককে বলা হয় কার্ডিনাল পয়েন্ট। কার্ডিনাল পয়েন্ট ৪টি।

২। কার্ডিনাল পয়েন্টগুলোকে কোনাকোনী ভাগ করলে ( যেমন উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম) সেগুলোকে সাব কার্ডিনাল পয়েন্ট বলা হয়। সাব কার্ডিনাল পয়েন্ট ৪টি।

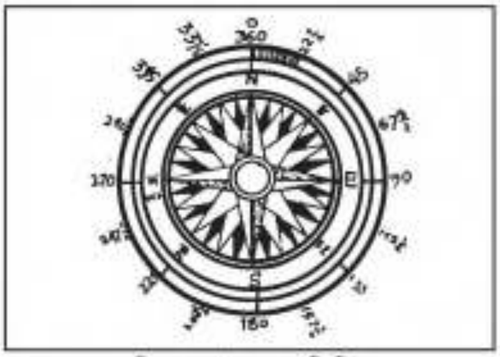

চিত্র ঃ কম্পাসের ১৬টি দিক

৩। সাব কার্ডিনালের কোনগুলোকে মাঝখানে কোনাকোনী ভাগ করলে অর্থাৎ উত্তর উত্তর-পূর্ব, পূর্ব পূর্ব-উত্তর, পূর্ব পূর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম পশ্চিম-দক্ষিণ, পশ্চিম পশ্চিম-উত্তর, উত্তর উত্তর-পশ্চিম ইত্যাদি দিকগুলো পাওয়া যায়। সাব সাব কার্ডিনাল পয়েন্ট ৮টি, কার্ডিনাল সাব কার্ডিনাল ও সাব সাব কার্ডিনাল পয়েন্ট মিলে মোট পয়েন্ট ১৬টি।

**দিক ও ডিগ্রীর সম্পর্ক ঃ**

১। কম্পাসের উত্তর দিককে ৩৬০° ডিগ্রী অথবা ০° ডিগ্রী ধরা হয়।
২। কম্পাসের পূর্ব দিককে ৯০° ডিগ্রী ধরা হয়।
৩। কম্পাসের দক্ষিণ দিককে ১৮০° ডিগ্রী ধরা হয়।
৪। কম্পাসের পশ্চিম দিককে ২৭০° ডিগ্রী ধরা হয়।

} এগুলো কার্ডিনাল পয়েন্ট

**কম্পাসের প্রয়োজনীয়তা ঃ** কোন অচেনা স্থানে যেতে হলে কম্পাস অবশ্যই সাথে নিতে হবে। কম্পাস দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করে। উড়োজাহাজ, নদী ও সাগরে চলাচলকারী যানে কম্পাস ব্যবহার করা হয়। স্কাউটরা হাইকিং-এ কম্পাস অনুসরন করে।

## ফিল্ডবুক

মানচিত্র অংকন করার পূর্বে কোন নির্দিষ্ট স্থানের খুঁটিনাটি তথ্য যে বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ফিল্ডবুক বলে। ফিল্ডবুক তৈরি হাইকিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে পথে হাইক করা হবে সে পথের ফিল্ডবুক তৈরি করে নিরিবিলিতে বসে সে ফিল্ডবুকের সাহায্যে মানচিত্র তৈরি করা যায়।

**ফিল্ডবুক তৈরির পদ্ধতি ঃ**

যে কাগজে ফিল্ডবুক তৈরি করা হবে তার ঠিক মাঝ বরাবর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত দু'টি সরল রেখা টানতে হবে যেো রেখা দুটির মধ্যে খানে আরম্ভ লিখে অথবা কোন চিহ্ন ব্যবহার করে (যেমন □ */ Start প্রভৃতি চিহ্ন) তার উপর খাড়া রেখা দু'টিকে একটি সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, হাইকার যে দিকে অগ্রসর হবে কাগজের অংকিত সরল রেখা তার পথের প্রতিকৃতি। এবার কম্পাস স্থাপন করে রাস্তাটি যে দিকে এগিয়ে গেছে প্রাপ্ত সে ডিগ্রী (আরম্ভ ওপরে অংকিত দাগের উপরিভাগে) লিখতে হবে। পরে কম্পাসে ডিগ্রী নির্ণয়ের সময় সে স্থান পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ

করা হয়েছিল সে স্থান পর্যন্ত দূরত্ব মেপে নিতে হবে এবং তা ফিল্ডবুকের যেখানে ডিগ্রী লেখা রয়েছে তার ঠিক উপরে লিখে মাপের এককের উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে দ্রুত অতিক্রম কালে যদি ডানে বা বামে কোন বিশেষ লক্ষনীয় কোন কিছু থাকে যেমন-রাস্তা, মসজিদ, মন্দির, বিদ্যালয়, কল-কারখানা, হাসপাতাল, পানির কল ইত্যাদি তার উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কনভেন্শনাল সাইন ব্যবহার করতে হবে।

**ফিল্ডবুক এর (নমুনা)**

| | | |
|---|---|---|
| | ৩২৭ ক<br>৯০° | কালভার্ট |
| রেল লাইন | ২৩৩ ক<br>০° | |
| | ১৬০ ক<br>৩০০° | পোস্ট অফিস |
| | ২৭৫ ক<br>২৭০° | |
| স্কুল<br>কাঁচা রাস্তা | ২৫০ ক<br>৩৩০° | পাকা রাস্তা<br>মসজিদ |
| | ১৩০ ক<br>৩০° | বড় গাছ<br>হাসপাতাল |
| পুকুর | ১৭২ ক<br>০° | কাঁচা রাস্তা |
| | আরম্ভ | |

এখানে ক অর্থ কদম

## মানচিত্র পাঠ ও ব্যবহার

মানচিত্র হচ্ছে স্কেলের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের সংক্ষিপ্ত আকারের তৈরি রেখা চিত্র। স্কেল হচ্ছে মূল ভূ-খন্ডের দুরত্বের সাথে মানচিত্রে প্রদর্শিত দূরত্বের আনুপাতিক হার। যেমন-মানচিত্রে প্রদর্শিত ১সে.মি. এলাকা সমান মুল-ভূ-খন্ডের ১০০০ কি.মি এখানে স্কেল হচ্ছে ১ সে.মি.=১০০০কি.মি.। স্কাউটিং-এ রেখা মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের মানচিত্রে কেবলমাত্র যাত্রাপথ ও পথের উভয় পাশের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়। একটি মানচিত্রের মৌলিক বিষয় হলো-

(১) দিক নির্দেশনা
(২) স্কেল/দূরত্ব
(৩) বিবরণ/সংকেত

**মানচিত্র অংকন :** একটি মানচিত্র অংকনকালে সর্বাগ্রে উপরদিকে, উত্তর দিক নির্দেশক চিহ্ন, স্কেল এবং সংকেতের উল্লেখ করে নিতে হয়। তারপর ফিল্ডবুক এর নির্দেশিত ডিগ্রী অনুসারে দূরত্ব এবং মানচিত্র নির্দেশিত স্কেলের অনুপাতে দূরত্ব নির্ণয় করে যে কাগজে মানচিত্র আঁকা হচ্ছে ঐ কাগজের প্রারম্ভিক বিন্দু নির্ধারণ করে কম্পাসের সাহায্যে ফিল্ডবুকের বর্ণিত দিক ও দূরত্ব সমাপ্ত করে কম্পাসের সাহায্যে ফিল্ড বুকের উল্লেখিত দিকে সূক্ষ্ম রেখা টানতে হবে। এভাবেই ফিল্ডবুকের বর্ণিত দিক ও দূরত্ব সমাপ্ত করলে একটি রেখা মানচিত্র পাওয়া যাবে। এ অংকন কালে ফিল্ডবুকের ডানে ও বামে যে চিহ্নগুলো উল্লেখ রয়েছে এ রেখা চিত্রের উভয়পাশে সে সকল চিহ্ন বসাতে হবে।

মানচিত্র আঁকার জন্য ৪টি D প্রয়োজন।

| | |
|---|---|
| D = Direction | D = Details |
| D = Distance | D = Difference in Height |

**প্রথম ডি'-কি নির্দেশনা (Direction) :** আমরা সকলেই জানি মানচিত্রে উপরের দিক উত্তর। এটা জানা সত্ত্বেও মানচিত্র অংকনের সময় দিক নির্দেশ করতে হবে। নতুবা দিক নির্দেশহীন মানচিত্র দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যাবে না।

**দ্বিতীয় ডি'- দূরত্ব (Distance) :** স্কেলের মাধ্যমে মানচিত্রে দূরত্ব নিরূপন করা হয়। এ দূরত্ব হচ্ছে মানচিত্রে প্রদর্শিত স্কেলে ১ ইঞ্চি বা ১ সেঃ মিঃ মূল ভূখন্ডের কতটুকু এলাকা প্রতিনিধিত্ব করছে।

**তৃতীয় ডি'- বিস্তারিত (Details) :** যে ভূখন্ডের মানচিত্র অংকন করা হবে সে এলাকার ভূমির উপর যা আছে তা বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে, যেমন রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কার্লভাট, নদী, মসজিদ, মন্দির, ইত্যাদি উল্লেখ মানচিত্রে থাকতে হবে। এগুলোকে Map Signature বা মানচিত্রের স্বাক্ষরও বলে। বিভিন্ন প্রকার কনভেনশনাল সাইন এর মাধ্যমে এগুলো মানচিত্র প্রদশিত হয়।

**চতুর্থ ডি' - ভূমি উচ্চতা (Difference in Height) :** মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা দেখানো হয় ভূমির বন্ধুরতা নিরূপক লাইনের মাধ্যমে। মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা নিরূপক লাইন ব্যবহার করা না হলে সেই মানচিত্র দেখে এ এলাকার ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যাবে না এবং ঐ ধরণের মানচিত্রকে পূর্নাঙ্গ মানচিত্র বলা যাবে না। মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শনের জন্য দু'ধরণের ভূমির বন্ধুরতা নিরূপক লাইন ব্যবহার করা হয়। একটি ব্যবহার করা হয় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা নিরূপনের জন্য। অপরটি ব্যবহার করা হয়, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমির গভীরতা নির্ণয়ের জন্য।

## মানচিত্র পাঠ

মানচিত্র পাঠ করতে হয় নিজের জন্য এবং আঁকতে হয় পরের জন্য। মানচিত্রে ব্যবহৃত "কনভেনশাল সাইন" সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না থাকলে মানচিত্র পাঠ করা যাবে না এবং মানচিত্র অনুসরন করে লক্ষ্যস্থলে পৌছানো যাবে না। মানচিত্রে ব্যবহৃত "কনভেনশাল সাইন" সম্পর্কে ভালভাবে অবহতি হয়ে সঠিকভাবে মানচিত্র অনুসরন করতে পারাকে "মানচিত্র পাঠ" বুঝায়। মানচিত্র সঠিকভাবে অনুসরন করে চলার জন্য প্রথমে প্রয়োজন সঠিকভাবে মানচিত্র সেট করতে পারা। মানচিত্র সঠিকভাবে সেট করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মানচিত্রে প্রদর্শিত উত্তর দিক এবং মূল ভূ-খন্ডের উত্তর দিক একই দিকে রেখে মানচিত্রে প্রদর্শিত কোন নির্দিষ্ট রাস্তাকে মূল ভূ-খন্ডের সে নির্দিষ্ট রাস্তা সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করা।

**কিভাবে মানচিত্র আঁকতে হয় ঃ**

মানচিত্র আমরা বিভিন্ন ভাবে আঁকতে পারি। যেমন ঃ ছাপা পদ্ধতি, গ্রীড পদ্ধতি, ফিল্ডবুক, ইত্যাদির মাধ্যমে। আমরা হাইক রুটের গতিপথ মানচিত্রে প্রদর্শিত করতে পারি। এই পদ্ধতিকে ট্রেভার্স পদ্ধতি বলে। ফিল্ডবুক ও কম্পাসের সাহায্যে এই মানচিত্র আঁকতে হয়। ফিল্ডবুকের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কদমকে একটি একক হিসেবে ধরে স্কেল নির্ধারণ করতে হয়। যেমন ১ ইঞ্চি = ১০০ কদম বা ৫০০ কদম। একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আঁকা শুরু করা যায়। তারপর ফিল্ডবুকের ডিগ্রী থেকে কদমের দূরত্ব নির্ণয় করে সামনে এগুতে হবে। প্রতি ধাপে নতুনভাবে কম্পাস স্থাপন করে দূরত্ব বের করতে হবে। এভাবে সর্বশেষ ডিগ্রী পর্যন্ত আসতে হবে। এই পদ্ধতির আঁকা মানচিত্রকে স্কেঃ মানচিত্রও বলা হয়। এই মানচিত্র ফিল্ডবুক ও কম্পাসের সাহায্যে যে কোন জায়গায় বসে অংকন করা যায়।

# কম্পিউটার

**ক) কম্পিউটার কী?**

কম্পিউটার বিজ্ঞানের ইলেকট্রনিক কৌশলের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। কম্পিউটার (Computer) শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Compute' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। Compute শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গণনা করা বা হিসাব করা যন্ত্র। অর্থাৎ কম্পিউটার শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গণনাকারী বা হিসাবকারী যন্ত্র।

এটা এমন একটি যন্ত্র যা মানুষের দেয়া উপাত্ত/তথ্য থেকে অতিদ্রুত ও নির্ভুলভাবে কোনো কাজের সহজ সমাধান করতে পারে। তবে বর্তমানে কম্পিউটার শুধু গণনা কাজেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রায় সবধরনের কাজ সমাধান করতে সক্ষম। যেমনঃ লেখাপড়া করা, মুদ্রণ করা, তথ্য সংরক্ষণ করা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, খেলা করা, দেশ-বিদেশে

তথ্যের আদান-প্রদান করা ইত্যাদি। কাজেই কম্পিউটার দিয়ে যেমন সকল প্রকার গণনাকার্য (যেমন: যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও বিশ্লেষণ) করা যায় তেমনি যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজও করা যায়। কোনো কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ কম্পিউটারের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব। প্রয়োজনে একটির পর একটি করে সে সকল নির্দেশ নির্ভুলভাবে ও তড়িৎগতিতে নির্বাহ করতে পারে।

কম্পিউটার হিসাব, সিদ্ধান্ত ও যুক্তিমূলক সমস্যার দ্রুত ও নির্ভুল সমাধান দিয়ে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর গতি, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতা মানুষের অনুরূপ ক্ষমতার তুলনায় বহুগুণ উন্নত। বস্তুত মানুষের দেয়া নির্দেশ অনুসারে কম্পিউটার কাজ করে, তবে তা করে মানুষের তুলনায় অতিশয় বিশ্বস্তভাবে ও নির্ভুলভাবে এবং অনেক দ্রুতগতিতে।

কম্পিউটার একটি ইলেকট্রিক কৌশলের চমকপ্রদ প্রয়োগ। এর মধ্যে রয়েছে অনেক ইলেকট্রিক বর্তনী। কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা আছে যার মাধ্যমে কম্পিউটারকে কাজের উপযোগী করে ব্যবহার করা যায়। সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ নিয়ম অনুক্রমে সাজানো নির্দেশের সমষ্টিকে নির্দেশমালা বা প্রোগ্রাম বলা হয়। উপযুক্ত নির্দেশের প্রভাবে কম্পিউটার জড় পদার্থ হতে গাণিতিক শক্তিসম্পন্ন একটি বুদ্ধিমান যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। অতএব, যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুতগতিতে নির্ভুল এবং সূক্ষ্মভাবে সমস্যা সমাধান করা যায়, তাকে কম্পিউটার বলে।

পরিশেষে বলা যায়, কম্পিউটার এমন এক বিদ্যুৎ-নির্ভর অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা সু-শৃঙ্খল নির্দেশের মাধ্যমে বাস্তব যে কোনো সমস্যা সমাধান ক্ষিপ্রগতিতে ও অতি অল্প সময়ে যথার্থ ও সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

**খ) কম্পিউটারের সাধারণ গঠন প্রণালীঃ**

প্রয়োগক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

**১) সাধারণ কম্পিউটার (General Computer) ঃ** আমরা সাধারনত যে কম্পিউটার ব্যবহার করি যাতে কোন কাজ করার পর প্রয়োজনীয় ডেটা সংরক্ষণ ও অপ্রয়োজনীয় ডেটা মুছে ফেলা যায় তাকে সাধারন কম্পিউটার বলে।

**২) বিশেষ কম্পিউটার (Special Computer) ঃ** সাধারণত কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট কাজের জন্য যে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় তাকে বিশেষ কম্পিউটার বলে। যেমন ঃ চোখের লেন্সের ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত অটোরিফ্রাক্ট মিটার।

গঠন ও ক্রিয়া নীতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১) অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer)

২) ডিজিটার কম্পিউটার (Digital Computer)

৩) হাই ব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)

**১) অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer) ঃ**

Analog শব্দটি এসেছে Analogous শব্দ থেকে যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সদৃশ্য। যে যন্ত্র দ্বারা বর্ণ এবং অংকের বদলে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সংকেত বা অ্যানালগ সংকেত ব্যবহার করে কোন কার্য সম্পাদন করা হয় বা কোন কাজের ফলাফল বের করা হয় তাকে অন্যালগ কম্পিউটার বলে। এর কার্য ক্ষমতা অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ মোটামুটি ০.১ %। যেমন ঃ গাড়ির মিটার, ভোল্ট মিটার ইত্যাদি।

**২) ডিজিটার কম্পিউটার (Digital Computer) ঃ** Digit শব্দ হতে ডিজিটাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হল অংক। যে যন্ত্রে বাইনারি সংখ্যা '০' ও '১' ব্যবহার করে কাজ করা হয়, হিসাবের জন্য বর্ণ ও অংক ব্যবহার করা হয় এবং প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল সরাসরি মনিটরে বা অন্য কোন আউটপুট ডিভাইসে প্রদর্শিত হয় তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে। এর সূক্ষ্মতা সবচেয়ে বেশি। যেমন ঃ Apple Power PC, IBM PC।

**৩) হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer) ঃ** অ্যানালগ কম্পিউটার ও ডিজিটাল কম্পিউটরের কার্যনীতির সমন্বয়ে গঠিত হয় হাইব্রিড কম্পিউটার। হাইব্রিড কম্পিউটারে সাধারণত ডেটা গ্রহণ হয় অ্যানালগ প্রক্রিয়ায় এবং সংগৃহীত ডেটা সংখ্যায় রূপান্তরিত করে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডিজিটাল অংশে প্রেরণ করা হয়। ডিজিটাল অংশে প্রাপ্ত ডেটা প্রক্রিয়াকরণের পর ফলাফল মনিটর কিংবা অন্য কোন আউটপুট ডিভাইসে প্রদর্শন করে। যেমন ঃ হাসপাতালে রোগীর তাপমাত্রা ও রক্ত চাপ মাপার যন্ত্র।

**ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ ঃ**

আমরা সাধারণত আধুনিক কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে বুঝি। আধুনিক কম্পিউটারকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। আকার-আয়তন, কাজ করার ক্ষমতা, মেমরি ও অন্যান্য সুযোগ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল কম্পিউটারকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

**১) মাইক্রোকম্পিউটার (Microcomputer):**

মাইক্রো (Micro) শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রাকৃতির মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি বলেই একে মাইক্রোকম্পিউটার বলা হয়। এ ধরনের কম্পিউটার সাধারণত একটি মাইক্রোপ্রসেসর বা CPU (Central Processing Unit), ROM, RAM ও I / O

ইন্টারফেস চিপ দ্বারা গঠিত। বর্তমানে মাইক্রোকম্পিউটার আকারে সবচেয়ে ছোট ও দামে কম। এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচও কম। মাইক্রোকম্পিউটারকে (Personal Computer) বা PC বলে। মাইক্রোকম্পিউটার বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যথা- ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, পামটপ, পিডিএ (PDA-Personal Digital Assistants) ওয়ার্কস্টেশন ইত্যাদি।

**মিনিকম্পিউটার (Minicomputer) :**

মিনিকম্পিউটার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণায় ও বিশ্লেষণে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোর তুলনায় মিনিকম্পিউটার অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এই জন্য মিনি কম্পিউটার বিভিন্ন ধরণের জটিল কাজে ব্যবহার করা যায়। টার্মিনালের সাহায্যেও প্রায় শতাধিক ব্যবহারকারী একসঙ্গে মিনিকম্পিউটারে কাজ করতে পারে। যেমন- IBM S/34, IBM S/36, PDP11, NCR S/9290 ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মিনিকম্পিউটার।

**মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainfram computer) :**

মেইনফ্রেম কম্পিউটার মিনি কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। মেইনফ্রেম কম্পিউটারে সব ধরনের পেরিফেরাল ব্যবস্থা, সব রকম হাই লেভেল ভাষা ও সব ধরনের সফট্ওয়্যার ব্যবহৃত হয়। এটা খুবই ব্যয়বহুল। অতি বৃহৎ শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উচ্চস্তরের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। মেইনফ্রেম কম্পিউটার একসঙ্গে শতাধিক ব্যবহারকারী টাইম শেয়ারিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারে। এর ডেটা সঞ্চয় ক্ষমতা খুব বেশী। যেমন- IBM 4300, UNIVAC 1100, CYBER 170 উল্লেখযোগ্য মেইনফ্রেম কম্পিউটার।

**সুপার কম্পিউটার (Super computer) :**

সুপার কম্পিউটার হল সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটার অর্থাৎ গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এদের সময় সবচেয়ে কম লাগে। সুপার কম্পিউটার মেইনফ্রেম কম্পিউটার থেকে শক্তিশালী। যেখানে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিরাট জটিল হিসাব করতে হয় সেখানে এদের প্রয়োজন। যেমন আবহাওয়া পূর্বাভাস, মহাকাশযান চালনা, প্রতিরক্ষা গবেষণা, বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র ডিজাইন,পরমাণু চুল্লীর ও সুপারসোনিক বিমানের ডানার ডিজাইন তৈরি, সিমুলেশন ও মডেলিং ইত্যাদি। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একটি সুপার কম্পিউটার রয়েছে। যেমন- আমেরিকার কন্ট্রোল ডেটা কর্পোরেশনের ETA-02P, জাপানের নিপ্পণ ইলেকট্রনিক কোম্পানীর Super SXII।

বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটারঃ-

**১. গ্রীন পার্সোনাল কম্পিউটারঃ** যে কম্পিউটারের উপাদানসমূহ কাজের উপযোগী করে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং বহুমুখী ব্যবহার করতে সুবিধা হয় এরূপ বিশেষ ডিজাইনের কম্পিউটারকে গ্রীন পার্সোনাল কম্পিউটার বলে। এর সংক্ষিপ্ত নাম **Green PC**। এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারে।

**২. নোটবুক কম্পিউটার :** নোটবুকের মত ছোট আকৃতির মাইক্রো কম্পিউটার যা সাধারণত হাতের উপরে রেখে কাজ করা সম্ভব এবং একে পকেটে রাখা যায় বলে একে নোটবুক কম্পিউটার বলে। তবে সাধারণত এরূপ কম্পিউটারকে একটি ক্যালকুলেটরের মত দেখায়। এটি সাধারণত ৪.৫ ইঞ্চি X ১১ ইঞ্চি দেখা যায়। কিছু কিছু নোট বুক কম্পিউটার এমনভাবে ডিজাইন করা আছে যেখানে প্লাগগুলো ডকিং **(Docking)** স্টেশনে থাকে যেখানে অনেক বড় আকারের মনিটর, কী-বোর্ড, মাউস এবং অন্যান্য ডিভাইস থাকে এবং অতিরিক্ত হার্ডওয়্যারের পেছন ভাগে দেখা যায়। কিছু কিছু নোটবুক কম্পিউটারে নেটওয়ার্ক কার্ড থাকে যা নোটবুক কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজন হয় না।

*নোটবুক কম্পিউটার*

এর আকারের অবস্থাভেদে এদের ছোট ডিসপ্লে ইউনিট, অল্প স্মৃতি এবং অল্প মজুত ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। অনেক মূল্যবান নোটবুক কম্পিউটার ডেক্সটপ কম্পিউটার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এর প্রসেসিং ক্ষমতা অন্যান্য পার্সোনাল কম্পিউটারের মতোই।

**৩. ল্যাপটপ কম্পিউটার :** এটি এক ধরনের মাইক্রো কম্পিউটার যা ল্যাপ বা কোলের উপর স্থাপন করে ব্যবহার করা যায়। এজন্য একে ল্যাপটপ কম্পিউটার বলে। এরূপ কম্পিউটার দেখতে অনেকটা ছোট একটা ব্রিফকেইসের মতো যা সহজে বহন ও স্থানান্তরযোগ্য।

৪. ডেস্কটপ কম্পিউটার : ডেস্ক বা টেবিলের উপর স্থাপন করে যে সকল মাইক্রো কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় তাকে ডেস্কটপ কম্পিউটার বলে। সাধারণ ধরনের মাইক্রো কম্পিউটারগুলোই ডেস্কটপ কম্পিউটার।

৫. ABC কম্পিউটার : ABC হলো Acronym for Afanason Berry Computer. এটাই প্রথম ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার। ১৯৪২ সালে Lowa State University এর John Atanasoff এবং Clifford Barry এটা তৈরি করেন।

৬. ACE Computer: ACE Computer এর সম্পূর্ণ নাম হলো Automatic Computing Engine. ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি এটা তৈরি করে।

**Computer পরিচিতি ঃ**

একটি Computer সাধারণত এ ৪টি অংশ যেমন ঃ

(i) System Box (ii) Monitor

(iii) Key Board/Mouse (iv) Printer.

**System Box : System box এ দুটি দিক থাকে ঃ**

i) **Front side** (সামনের অংশ)

ii) **Back side** (পিছনের অংশ)

**Key Board পরিচিতি ঃ**

সাধারনত ঃ কী বোর্ডে ১০১ থেকে ১১২ টি Key থাকে। এই কী গুলিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ঃ নিউমেরিকাল কী, টাইপিং কী, স্পেশাল কী ও ফাংশোনাল কী।

**মাউসঃ**

কম্পিউটারে সুক্ষ তার দ্বারা সংযুক্ত ইদুরের মত ছোট্ট যন্ত্রটির নাম মাউস। উইন্ডোজে এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। মাউস ছাড়া উইন্ডোজে কাজ করা কষ্টকর। এর সম্মুখ ভাগে ২/৩ ভাগে বাটন থাকে। এই বাটন চেপে (সাধারণত ঃ বাম বাটনে) কাজ করতে হয়।

**প্রিন্টার ঃ**

কোন ফাইল বা প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রিন্ট বা লেখা আকারে কাগজে বের করার জন্য Printer ব্যবহার করা হয়।

**কম্পিউটারের আবিস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-**

কম্পিউটার আবিস্কারের কৃতিত্ব কোনো একক ব্যক্তির নয়। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের অজস্র বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছি আজকের এই কম্পিউটার। এ প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডের গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৮২১ সালে চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) বিয়োগপদ্ধতি ব্যবহার করে প্রযুক্তিভিত্তিক একটি স্বংক্রিয় হিসাবযন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। এর নাম দেন ডিফারেন্স ইঞ্জিন (Difference Engine) কিন্তু প্রযুক্তিগত কারণে তা সম্পূর্ণ নির্মাণ করতে পারেননি। ১৮৩২ সালে ব্যাবেজ ও যোসেফ ক্লিমেন্ট (Joseph Clement) মূল ডিফারেন্স ইঞ্জিনের এক- সপ্তমাংশ নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রটিকে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর হিসেবে গণ্য করা হয়। এর আবিস্কারের মধ্যে দিয়ে কম্পিউটারের ধারণা পাওয়া যায়। তাই সর্বপ্রথম কম্পিউটারের ধারণা এবং পরিকল্পনা প্রধানের জন্য **চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক** বলা হয়। জন ভন নিউম্যান (John Von Neumann) কম্পিউটার আবিস্কারের গুরুপূর্ণ তথ্যভিত্তিক প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই ইউএস আর্মি (মশলী ও ইকার্ট) ১৯৪৫ সালে EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) তৈরি করেন। তাঁর প্রস্তাবগুলো ছিল-

ক) কম্পিউটার যন্ত্রের জন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং

খ) কম্পিউটার যন্ত্রের অভ্যন্তরেই ডেটা ও নির্বাহ সংকেত মওজুত রাখা যেতে পারে।

জন ভন নিউম্যান প্রস্তাবিত এ স্থাপত্য আজও আধুনিক কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় যা "জন ভন নিউম্যান স্থাপত্য" নামে পরিচিত। এই কারণেই **জন ভন নিউম্যানকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক** বলা হয়।

**কম্পিউটার আবিস্কারে যাদের অবদান রয়েছে তারা হলেন:**

জন নেপিয়ার, শিকার্ড, ব্লেইজ প্যাস্কেল, লাইবনিৎস, মুলার, লেডি, অগাস্টার, স্টেফেন বলডুইন, মেরি জেকার্ড, হলিরিথ , ড. হেরম্যান প্রমূখ।

চিত্র : ESAC

১৯৫১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে হোয়ার্লউইন্ড-১ কম্পিউটার নির্মাণের কাজ শেষ হয়। সে বছরই ড. জন মউসলি ও প্রেসপার একার্ট ইউনিভ্যাক (ইউনিভার্সাল অটোমেটিক ক্যালকুলেটর) কম্পিউটারের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ইউনিভ্যাক (UNIVAC-Universal Automatic Computer) হলো সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার। এ সময় হতেই বিভিন্ন কোম্পানি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কম্পিউটার তৈরি শুরু করে। আই-বি-এম কোম্পানি ১৯৫৪ সালে কম্পিউটারের ব্যবসা শুরু করে।

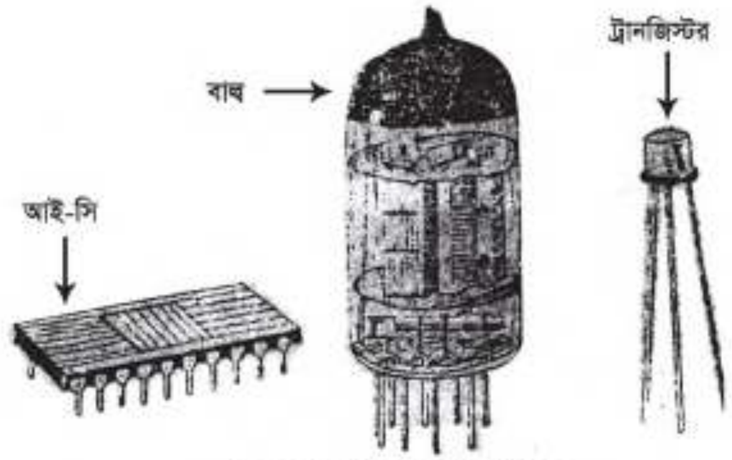

চিত্র ঃ আই-সি, বাল্ব ও ট্রানজিস্টর

একীভূত বর্তনী বা ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (আই-সি) নামে এক ধরনের বিশেষ ইলেকট্রনিক বর্তনী ব্যবহার করা হয় তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে। এক একটি আই-সি চিপের অভ্যন্তরে অনেক অর্ধপরিবাহী ডায়োড, ট্রানজিস্টর ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ থাকে বিধায় কম্পিউটারের আকার অনেক ছোট হয়, বিদ্যুৎ খরচ আরও কমে যায় এবং নির্ভরযোগ্যতার পরিমাণ বেড়ে যায়। ইনটিগ্রেটেড সার্কিটের দ্রুত উন্নয়নের ফলে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশকে একটি চিপের আকারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এই চিপকে মাইক্রোপ্রোসেসর বলা হয়। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইনটেল কোম্পানি সর্বপ্রথম ইনটেল ৪০০৪(Intel-4004) নামের যে মাইক্রোপ্রোসেসর তৈরি করে তাতে ছিল ২২০০ ট্রানজিস্টর।

চিত্র ঃ একটি বৃহৎ কম্পিউটার পদ্ধতি

## ঘ) কম্পিউটারের সাধারন ব্যবহার -

### Computer চালু করার নিয়ম ঃ

প্রথমে Systembox বা CPU (Central Processing Unit) এর Power On করতে হবে (ইউপিএস থাকলে প্রথমে তার Power On করতে হবে)। তারপর Monitor এর Power On করতে হবে। কিছুক্ষণ পর একটি Screen দেখা যাবে যা Desktop নামে পরিচিত।

### Computer বন্ধ করার নিয়ম ঃ

সাধারণত মাউস দিয়েই বেশির ভাগ সময়ে কম্পিউটার বন্ধ করতে হয়। তাছাড়া কি বোর্ড দিয়েও বন্ধ করা যায়।

Start বাটনে ক্লিক করুন। Start ডায়ালগ বক্স আসবে। এরপর Shut down/ Turn off Computer বাটনে ক্লিক করুন। Turn off Computer ডায়ালগ বক্স আসবে। এবার Turn off বাটনে ক্লিক করুন। কিছুক্ষন পর কম্পিউটারটি বন্ধ হয়ে যাবে।

### Desktop পরিচিতি ঃ

প্রথমে CPU এর Power On করার পর কিছুক্ষণ পরে একটি Screen দেখা যাবে। ঐ Screen টির নাম Desktop.

এরপর Start মেনুতে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যায়, যেমন ঃ লেখার জন্য MS Word এ ক্লিক করে এপ্লিকেশন সফটওয়ার এর মাধ্যমে বাংলা, ইংরেজি, গাণিতিক ইত্যাদি ভাষা লেখা যায়।

# গান জানা

প্রত্যেক স্কাউটকে নির্দিষ্ট কতকগুলি গান জানতে হবে। গানের কথা মুখস্থ করতে হবে ও সঠিক সুরে গাইতে হবে। যেমন- জাতীয় সংগীত, প্রার্থনা সংগীত, স্কাউটের গান প্রভৃতি। আমরা জাতীয় সংগীত গাই। ট্রুপ মিটিং এ প্রার্থনা সংগীত গাই। এছাড়া বিভিন্ন সময় নিজেকে আরো সজীব ও আনন্দময় কাজের পরিবেশ তৈরি এবং অনুষ্ঠানে যোগদানে নির্দিষ্ট কিছু গান গাইতে হয়। যার কথা ও সুর জানা থাকলে সমস্বরে সবাই গাইতে পারা যায়। স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজে চারটি গান শিখতে হবে। ইতোপূর্বে সদস্য ব্যাজে তুমি তিনটি গান শিখেছ। ঐ তিনটি ছাড়া আরো চারটি গান তোমাকে সঠিক কথা ও সুরে এবার শিখতে হবে।

তুমি এই গানগুলির কথা ও সুর সঠিকভাবে জানতে সিডি সংগ্রহ করতে পারো। যা স্কাউট শপে পাওয়া যাবে। নিচে চারটি গানের কথা দেওয়া হল-

১। 

## প্রার্থনা সংগীত

হে খোদা দয়াময়, রহমান রহিম
হে বিরাট, হে মহান, হে অনন্ত অসীম॥
নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি,
তুমি নিত্য সত্য পবিত্র অতি,
চির অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি
তুমি সুন্দর মঙ্গল মহামহিম॥

তুমি মুক্ত স্বাধীন বাধা বন্ধনহীন
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন
তুমি সৃজন পালন ধ্বংশকারী
তুমি অব্যয় অক্ষয় অনন্ত আদিম॥

আমি গুনাহগার পথ অন্ধকার
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার
আমি চাইনা বিচার রোজ হাশরের দিন।
চাইনা করুনা তোমার ওগো হাকিম।

কথা ঃ কবি গোলাম মোস্তফা

২। **দেশাত্মবোধক গান**

ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, কোথায় এমন উজ্জ্বল ধারা।
কোথায় এমন খেলে তরিৎ এমন কালো মেঘে।
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জাগে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
ভায়ের মায়ের মত এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

কথাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩। ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার

ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার॥

দাও ইয়েল, দাও ইয়েল-দাবানল জ্বললো
ললো জিহ্বা তাহার আকাশে উড়লো।
ধরলো আগুন দ্বিগুন তেজে
রূপ নিলো আজ একোন সাজে
হিক বাহার, হিক বাহার, হিক বাহার।
ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার॥
সারা মাঠ ভরলো আলোর বানে
উল্লাস উঠলো গানের তালে
হউক জয় এইবার, এইবার, এইবার॥

ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার॥

কথাঃ নকোলাস ডি রোজারিও

৪। **We Shall Overcome**

We Shall overcome (ii)
We Shall overcome day some day
O deep in my heart
we do believe that
We Shall overcome some day
আমরা করব জয় আমরা করবো জয়
আমরা করব জয় একদিন।
আহা বুকের গভীরে আমরা জেনেছি যে,
আমরা করব জয় একদিন।

We are not alone (ii)
we are not alone today
O deep in my heart
we do believe that
We Shall overcome some day
আমরা নই একা-(২)
আমরা নই একা-আজকে
আহা বুকের গভীরে আমরা জেনেছি যে,
আমরা নই একা আজকে।
We are not afraid (ii)
we are not afraid today
O deep in my heart
we do believe that
We Shall overcome some day
আমাদের নেই কোন ভয় (২)
আমাদের নেই কোন ভয় আজকে
আহা বুকের গভীরে আমরা জেনেছি যে,
আমাদের নেই কোন ভয় আজকে।

## ট্রুপ মিটিং

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জন করতে হলে অন্ততঃ ১২-১৫টি ট্রুপ মিটিং এ তোমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। ট্রুপ মিটিং এ অংশগ্রহণ করে তুমি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজের প্রোগ্রামগুলি শিখতে ও চর্চা করতে পারবে। নিয়মিতভাবে স্কাউটিং-এ সম্পৃক্ত থাকলে ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ তোমার জন্য খুবই সহজ ও নিয়মিত ব্যাপার। মাই প্রোগ্রেস-এ ইউনিট লিডার মূল্যায়ন করবেন; যা তোমার রেকর্ড হিসেবে থাকবে।

নোট

নোট

নোট

নোট

## বাংলাদেশ স্কাউটস


**জাতীয় সদর দফতর**

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন: ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪ এক্স-৩০, ফ্যাক্স : ০২ ৯৩৪২২২৬

e-mail : scouts@bangla.net

Web: www.scouts.gov.bd